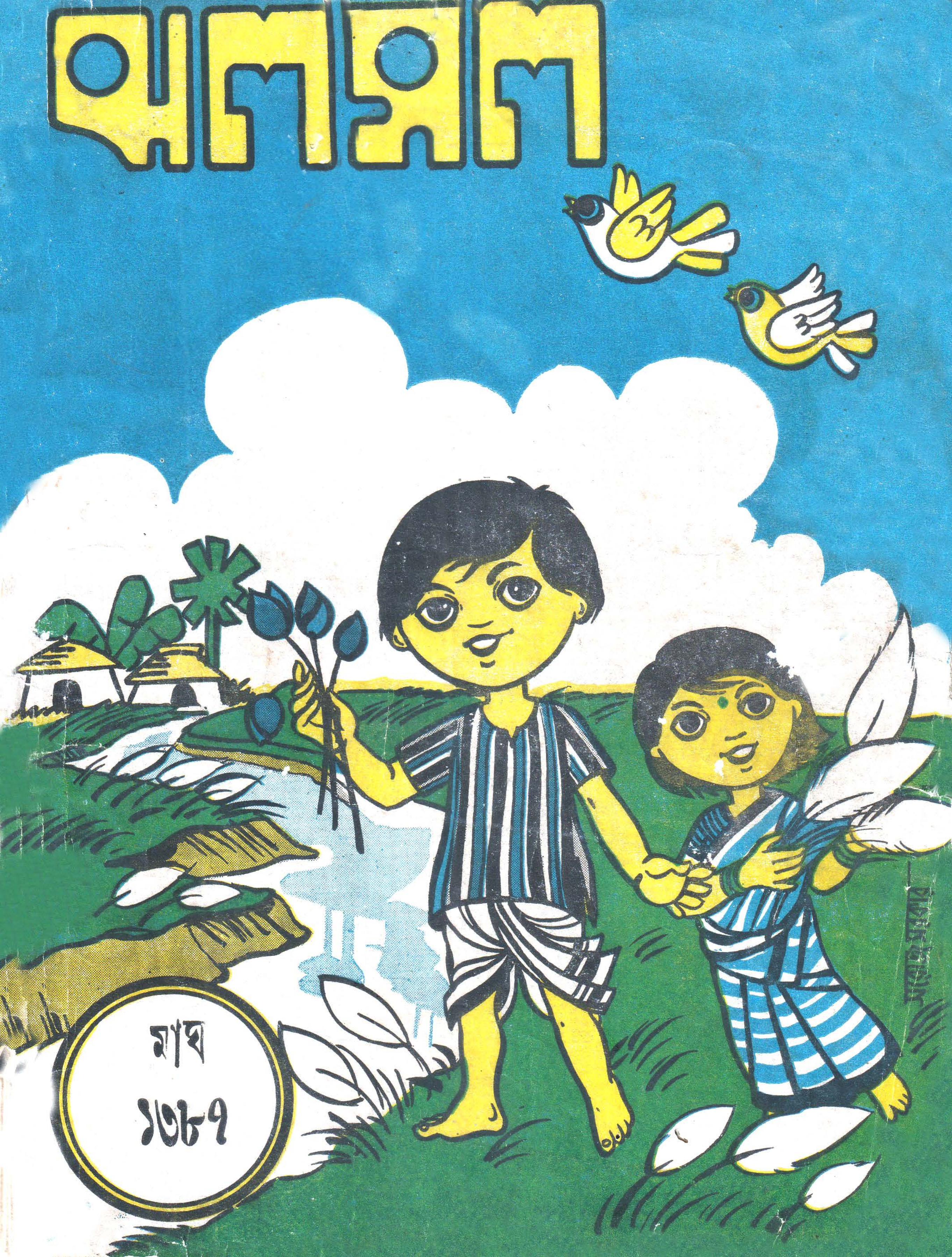

ঝলমল
মাঘ
১৩৮৭



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ প্রিয়াঙ্কা গোসাভি

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

শুভেচ্ছা

'ঝলমল' ছোটদের মনের জগৎ রঙে রসে স্বপ্নে সত্যে কল্পনায় ঝলমলিয়ে তুলুক এই আশা জানাই।

[illegible]

ঝলমলকে আশীর্বাদ

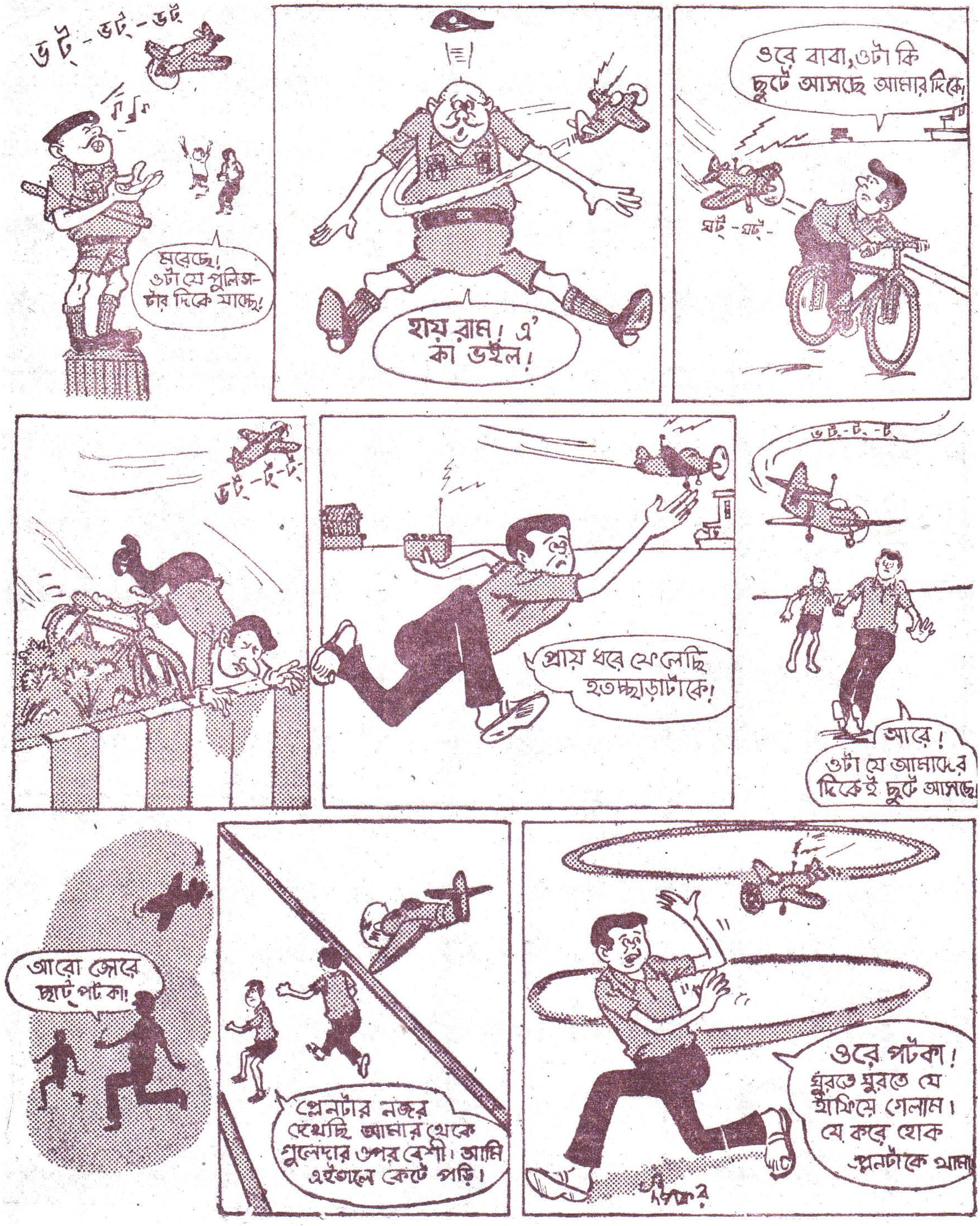
তুমি ঝলমল কর। এর বেশী কি আশীর্বাদ করব? রাংতায় রোদ পড়লে যেমন ঝক্‌মক্‌ করে, সে রকম ঝলমল নয়। হীরের টুকরোয়, কিম্বা পাহাড়ি নদীর ছোট ছোট ঢেউয়ের ওপর সূর্যের কিরণ পড়লে যেমন আলো ঠিকরোয়, এ সেই রকম। হঠাৎ সবাই টের পায় মানুষের জীবনটা কত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। অন্ধকার ঘরে মশালের আলো ফেললে যেমন অন্ধকার কোণাগুলোও ঝলমল করে ওঠে, তেমনি করে অজ্ঞানতার অন্ধকার যেখানে যেখানে জমে আছে, সেখানে আলো ফেলে সবাইকে সব কথা জানিয়ে দাও। অমাবস্যার রাতে বিপজ্জনক পথে বেরোলে যেমন সাহসীদেরও মনের মধ্যে ভয় ভয় করে, কিন্তু টর্চ জ্বালালেই দেখা যায় ওগুলো বটগাছের শেকড়ের জট ছাড়া আর কিছু নয়, মোটেই কুণ্ডলী পাকানো অজগর নয়; তেমনি করে দেশের সব ছেলেমেয়েদের মন থেকে পুরনো ভয়গুলো দূর করে, সাহস দাও।

ঝলমল, তুমি ভবিষ্যতের পথের ঠিকানা দাও। ইতি—

লীলা মজুমদার.


গুলেদা
দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
আরে! গুলেদা তুমি যে পাকা ইলেক-ট্রিশিয়ানের মত মডেল প্লেন তৈরি করছ।
আয় পটকা। তোর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।
একটা ইলেকট্রনিক্সের বই দেখে এই মডেল প্লেনটা তৈরি করেছি। আর এটাকে ওড়ানোর জন্য রেডিও কন্ট্রোলার তৈরি করেছি। এবার এটাকে ওড়াব।
প্লেনটাকে উড়িয়ে, পটকার সঙ্গে একটু মজা করব।
এই সেরেছে! ওটা দেখছি আমার দিকে ছুটে আসছে!
হিঃ! হিঃ!
ঘট্-ট্-ট্-ট্
গুলেদা, তোমার প্লেনটাকে সামলাও!
এইরে! ওটা যে আমার দিকেই তেড়ে আসছে!
রেডিও কন্ট্রোলারটা বিগড়ে গেছে! আরে প্লেনটা যে রাস্তার দিকে চলে গেল!

গুলেদা



ভট্-ভট্-ভট্
মরেছে! ওটা যে পুলিস-টার দিকে যাচ্ছে!
হায় রাম! এ কা ভইল!
ওরে বাবা, ওটা কি ছুটে আসছে আমার দিকে!
ঘট্-ঘট্-
ভট্-ট্-ট্
প্রায় ধরে ফেলেছি হতচ্ছাড়াটাকে!
ভট্-ট্-ট্
আরে! ওটা যে আমাদের দিকেই ছুটে আসছে!
আরো জোরে ছোট্ পটকা!
প্লেনটার নজর দেখেছি আমার থেকে গুলেদার ওপর বেশী। আমি এইতালে কেটে পড়ি।
ওরে পটকা! ঘুরতে ঘুরতে যে হাঁফিয়ে গেলাম। যে করে হোক প্লেনটাকে আনা



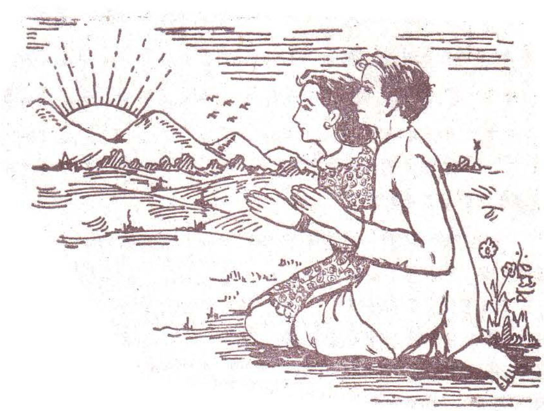
তৃতীয় বর্ষ   মাঘ, ১৩৮৭   দশম সংখ্যা

সবার প্রতি

সজল চক্রবর্তী

সূর্যের মতন জীবনটাকে গড়ো—
আলোয় আকাশ দিক্‌ দিগন্ত ভরো ;
মেঘ ভেঙে দাও রৌদ্র ছড়াও,
সব বাধা ভয় দুঃখ সরাও
অনেক···অনেক দূরে—

লজ্জা ফেলে এগিয়ে এসো,
সবার সাথে সবাই মেশো—
একসাথে হাত ধ'রতে হবে
জীবনটাকে গড়তে হবে
নতুন গানের সুরে ।।



মুক্তি

অর্ধেন্দুশেখর সেনগুপ্ত

গজা মামাকে যমের মত ভয় করে ঝণ্টু। ইয়া বড় চেহারায় বিরাট গোঁফ, পান থেকে চুন খসলেই রেগে আগুন। মামার কথার নড়চড় হবার উপায় নেই। যা বলবে তখনই করতে হবে। এ হেন গজা মামা একদিন অফিস ফেরবার সময় এক বাক্স সন্দেশ হাতে নিয়ে হাসি মুখে ঢুকলেন। ঝণ্টু ভাবে, মামার আজ হল কি?

ঝণ্টুর হাতে গোটা দুই সন্দেশ দিয়ে মামা বলেন, জানিস ঝণ্টা, আজ বাজীমাৎ। ঝণ্টু বুঝতে পারে না, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। মামা সবিস্তারে বলেন, কুসওয়ার্ডে আজ বাজীমাৎ করেছি। পেয়ে গেছি ২০০ টাকা। এবার নিশ্চিন্ত মনে সন্দেশ খেতে শুরু করে ঝণ্টু। তারপরই মামা বলেন, ভুলুটা খুবই পয়মন্ত রে। আজ যাবার সময় তাকে দেখেছি। ফেরার সময়ও তাকে দেখলাম। তার একটা কিছু করা দরকার। তোকে একটা কাজ করতে হবে? কাজের কথা শুনেই ঝণ্টুর গলায় সন্দেশ যেন আটকে যায়।

মামা বলতে থাকেন, কাল ওকে কিছু খাওয়াব। ওকে তুই হাজির করবি। আর শোন্, প্রত্যেক দিন অফিস যাবার সময় আর আসার সময় ওকে আমার চাই। কাঁচুমাচু মুখ করে ঝণ্টু বলে, ও কি আমার কথায় হাজির হবে? মামা ধমকে বলেন, অপদার্থ, ওকে আনতে হবে কায়দা করে। চার আনা রোজ তোকে দেব, বিস্কুট খাওয়াবি ও সময়। দেখবি, বিস্কুটের লোভে ঠিকই হাজির হবে।

পরদিন মামা এলেন সঙ্গে কিছু খাবার এবং একটা কাগজে মোড়া কি যেন। ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঝণ্টু ভুলুকে হাজির করল। বলতে ভুলে গেছি ভুলু হচ্ছে পাড়ার একটা বেওয়ারিশ কুকুর। মামা কাগজের মোড়ক খুলে একটা মালা বের করে পরালেন ভুলুর গলায়। তারপর যত্ন করে খাওয়ালেন তাকে। পরদিন থেকে ভুলুর বরাদ্দ চার আনা ঝণ্টুর হাতে দিয়ে অফিস বেরিয়ে যেতেন। ঝণ্টু বিস্কুট এনে নিজে কিছু নিয়ে বাকীটা ভুলুকে খাওয়াতে লাগল। অভ্যাসবশে ভুলু রোজই একই সময়ে আসে। মামা খুশী। নিত্য বিস্কুট খেতে পেয়ে ঝণ্টুও খুশী। মায়া পড়ে গেছে ঝণ্টুর ভুলুর ওপর।

সাতদিন পরের কথা। মামা অফিস থেকে ফিরলেন গম্ভীর মুখে। মানি ব্যাগ পকেটমার হয়ে গেছে। ঢোকার মুখে দেখলেন ভুলুকে। সে দিকে না তাকিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। পরদিন এলেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে—ট্রাম থেকে নামবার সময় পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছেন। সেদিনও যথারীতি উপেক্ষা করলেন ভুলুকে। তৃতীয়দিন মামা এলেন একেবারে জামাছেঁড়া অবস্থায়। খেলা ভাঙ্গার পর গাড়ীতে উঠতে গিয়ে ভীড়ের চাপে এই অবস্থা হয়েছে। ঢোকার মুখে ভুলুকে দেখেই অগ্নিশর্মা। যেন সমস্ত ব্যাপারের জন্যে ভুলুই দায়ী। মানি ব্যাগ হারানোর দিন থেকেই ভুলুর বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেছে। ঝণ্টু কিন্তু যখন যা পায় ভুলুকে গোপনে দিয়ে আসছে।

গম্ভীর কণ্ঠে মামা হাঁক দিলেন, ঝণ্টা—কালকে যদি ভুলুকে বাড়ীর ত্রিসীমানায় দেখি তাহলে ওটাকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেব। তুই ওকে এদিকে ঘেঁষতে দিবি না। যদি আমার কথার নড়চড় হয় তাহলে কি হবে বুঝতে পারছিস? ঝণ্টু পড়েছে দোটানায়। যতই মারধোর কর না কেন ঘুরে ঘুরে ভুলু হাজির হচ্ছেই। ডিউটিতে ফাঁকি দিলে মামার হাতে রক্ষে নেই। ঝণ্টু ভাবে, এ থেকে মুক্তি পাবে কি করে? ভুলু যদি আর না আসে তাহলেই হয়ত তার ছুটি, তার মুক্তি।

সকাল সন্ধ্যে তাকে সজাগ থেকে পাহারা দিতে হচ্ছে—ভুলু যাতে মামার চোখের সামনে এসে না পড়ে। হঠাৎ একদিন বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল জাল-ঘেরা একটা গাড়ী। সেখান থেকে বেরিয়ে এলো একদল লোক—ভুলুও হাজির হয়েছিল সেখানে। তাকে তুলে নিল গাড়ীতে। গাড়ীর মধ্যে ছিল ভুলুর মতো একপাল বেওয়ারিশ কুকুর।

ঝণ্টুর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল টপ টপ করে। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ভুলুর হাত থেকে মুক্তি পেতে সে চেয়েছিল। কিন্তু এ ভাবে মুক্তি যে ভুলু তাকে দিয়ে যাবে সে ভাবে নি। মামার হাত থেকে মুক্তি ঝণ্টু পেয়েছে। যে বাঁধনে ভুলু তাকে বেঁধেছে তার থেকে মুক্তি কি আছে?



[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

নলীগোপাল আইচ

[আগেকার কথা ঃ—একটা জাহাজ জাম্বেসী নদীর ধারে নোঙ্গর-করা ছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন হেনরী রাত্রে ডেকে বসে চাঁদের আলোয় চারিদিকের শোভা দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি কাগজে-দেখা শুক্রযানের মত একটা কিছুকে নদীর ধারে দূরের বনের মধ্যে নেমে পড়তে দেখলেন। তাঁর মুখ থেকে সেই কথা শুনে শুক্রযানকে দেখবার জন্য জর্জ তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে বনের মধ্যে চলে গেলেন। তাঁরা শুক্রযানকে দেখতে পেলেন না। দু'জন কালো লোক ও একজন ফর্সা লোককে শুক্রযানের লোক ভেবে তাদের জাহাজে নিয়ে এলেন। জাহাজ পরে মাদাগাস্কারের পাশ দিয়ে মরিশাসে গিয়ে পৌঁছল। জাহাজের সকলে অতিথিভবনে উঠলেন। মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী শিউ-সাগর রামগুলাম শুনলেন, জাহাজের লোকেরা টারজানকে বন থেকে ধরে নিয়ে এসেছেন। তিনি টারজানকে দেখতে অতিথিভবনে গিয়েছিলেন। তাঁর বাসভবনে যাবার সময় চিড়িয়াখানা থেকে পালানো বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে টারজান আহত হল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোল। টারজান হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ক্যাপ্টেন হেনরি জাহাজ নিয়ে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে। সেখান থেকে গেলেন সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে। টারজান ও তার দুই সঙ্গী জাহাজ থেকে পালিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন হেনরি জাহাজ নিয়ে চলে গেলেন। পরে এক জাহাজে করে টারজান, কুণ্ডা ও গোমা সালভাডর বিমানবন্দরে পৌঁছল। তারপর তারা বিমানে করে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে পেঁছল। সেখানে গ্রীনল্যাণ্ডের এক এস্কিমো সর্দারের ছেলেকে টারজানের খুব ভালো লাগল। এক সার্কাসের ম্যানেজার টারজানকে সার্কাস পার্টিতে যোগ দেওয়াবার জন্য খুব চেষ্টা করল। কিন্তু টারজান রাজী হল না। সিরেনসেন টারজানকে গ্রীনল্যাণ্ডে যেতে বলল।]

টারজান এরিককে কোলে করে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। সে দেখল, বাইরে পেঁজা তুলোর মতো কী সব পড়ছে। প্রচণ্ড ঝড় বইছে। ঝড়ে গাছপালা নুয়ে নুয়ে পড়ছে।

টারজান কুণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাইরে সাদা সাদ কী ঝরে পড়ছে ?'

কুণ্ডা কিছু বলবার আগেই সিরেনসেন বলল, 'তুষার পড়ছে।'

টারজান তুষার কী তা বুঝতে পারল না। সে ক্যালফ্যাল করে সিরেনসেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটায় জানালার একটা কাচের

শারসি খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক তুষার ঘরের মধ্যে এসে গেল।

টারজান, সিরেনসেন, কুন্ডা সবাই জানালার কাছ থেকে সরে এল।

প্রচন্ড ঠাণ্ডায় টারজান কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। সিরেনসেন তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিল। ঘরের মধ্যে তুষারঝড় আসা বন্ধ হল বটে কিন্তু ঠাণ্ডা ভাব আগের মতোই রয়ে গেল।

সিরেনসেন বলল, তার দেশ গ্রীনল্যাণ্ডে রাতদিন এই রকম তুষারপাত হয়। প্রায় সব সময়েই ঝড় বয়—কম আর বেশী। চারিদিকেই শুধু বরফ। না আছে গাছপালা, না এখানকার মতো ঘরবাড়ি। লোকে বরফের ঘরে বাস করে। বড় বড় বরফের চাঁই সাজিয়ে ঘর তৈরী হয়। নীচু ঘর। তার কোন জানালা নেই। ভিতরে যাবার একটি মাত্র দরজা। হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে যেতে হয়।

তাদের দেশে যে কী রকম প্রচন্ড ঠাণ্ডা, তা সেখানে না গেলে বোঝা যাবে না। ও দেশের লোকের সেই ঠাণ্ডাতেই থেকে থেকে একরকম অভ্যেস হয়ে গেছে।

কুণ্ডা জিজ্ঞেস করল, সিরেনসেনকেও ওই রকম বরফের ঘরে থাকতে হয়? এরিকের মতো ছোট ছেলেমেয়ের ঠাণ্ডা লেগে সর্দি কাশি, এমন কি নিমোনিয়া হয় না?

সিরেনসেন হেসে বলল, না, তা হয় না। তবে সে ওই রকম বরফের ঘরে থাকে না। ডেনিশ সরকার ওখানে অনেক পাকা বাড়ি করে দিয়েছে। সে তার একটাতে থাকে। তাহলেও তাদের প্রচন্ড ঠাণ্ডা সহ্য করতে হয়। অবশ্য, সে সবে তাদের অভ্যেস হয়ে গেছে।

গোমা কুণ্ডাকে বলল, 'সিরেনসেন তো তার দেশ গ্রীনল্যাণ্ডে ফিরে যাবে। এখন আমাদের আফ্রিকায় চলে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

দস্যু-জাহাজের প্রচুর টাকা গোমা-কুণ্ডার কাছে আছে। উড়ো জাহাজে করে চলে যাবার টাকার অভাব হবে না। এখানে তাদের মিছিমিছি পড়ে থাকা। কিন্তু মুশকিল হয়েছে টারজানকে নিয়ে। তার মতলব বোঝা যাচ্ছে না।

আফ্রিকার গরম হাওয়ায় সেখানকার বনে জঙ্গলে তারা টারজানের সঙ্গে বহুকাল একসঙ্গে কাটিয়েছে। তাকে তারা ছেড়ে চলে যেতে পারে না। তারা গ্রীনল্যাণ্ডে গিয়ে থাকতে পারবে না। টারজান যে কী করবে, তা তারা বুঝে উঠতে পারল না।

টারজান এরিককে কাছছাড়া করতে চায় না। আবার গ্রীনল্যাণ্ডেও যেতে চায় না। তার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলেছে। সে এরিককে নিয়ে পালিয়ে যাবে। সে যে কী কাণ্ড করে বসবে। তা ভেবে কুণ্ডা-গোমা অস্থির হয়ে পড়ল।

সিরেনসেন বাইরে যাবার জন্য দরজা খুলতেই প্রচন্ড তুষারঝড় ঘরের মধ্যে ঢুকল। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে সোফায় বসে পড়ল।

এতক্ষণ টারজান চুপ করেই ছিল। সে এবার সিরেনসেনকে বলল, তোমাদের দেশে কেন যাবে? চল না আমাদের দেশে। সেখানে কত গাছপালা। গাছে গাছে ফুল ফল। ফুল পেড়ে এরিককে দেব। তোমাদের সবাইকে কত ফল দেব, নদীর জলে স্নান করবে। কত পশু পাখী দেখতে পাবে।

সিরেনসেন বলল, তোমাদের দেশ তোমাদের কাছেই ভালো। আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাব। অবশ্য দেশে আমি বেশী সময়ই থাকি না। ব্যবসা করতে কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও নানা জায়গায় যাই। সেইসব জায়গাতেই বছরের বেশী সময় কেটে যায়। তুমি চল না। আবার আমার সঙ্গে ফিরে আসবে।

সিরেনসেনের এই কথা কুণ্ডা-গোমার মনে ধরল। সিরেনসেনের সঙ্গে গেলে একটা নতুন দেশ দেখা হবে। আর তারা তো ফিরেই আসবে।

টারজানকে সব কথা তারা বুঝিয়ে বলল। টারজান মাথা নেড়ে তাদের কথায় সায় দিল। বলল, সিরেনসেনের সঙ্গে সে যাবে কিন্তু বেশী দিন থাকবে না। তাকে আফ্রিকায় চলে যেতেই হবে।

কুণ্ড-গোমা সিরেনসেনকে বলল, বেশ, তাই হবে। আমরা তোমাদের দেশে যাব। কিন্তু বেশী দিন থাকব না। যা ঠাণ্ডা তোমাদের দেশ!

সিরেনসেন বলল, না, বেশীদিন থাকতে হবে না।



জানালার ধারে টারজান ; তার কোলে এরিক

তাকে তো ব্যবসার জন্য যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে চলে আসতে হবে। অনেক জিনিসপত্র সরবরাহ করার অর্ডার সে পেয়েছে।

ঠিক হল, সিরেনসেন দুর্যোগ থামলে কুণ্ডা, গোমা আর টারজানের পাশপোর্টের ব্যবস্থা করবে।

তিন চার দিন কেটে গেল। ঝড়ের প্রকোপ একটু কমলেও তুষারপাত বন্ধ হল না। কাজেই কদিন কুণ্ডা, গোমা ও টারজানকে ঘরের মধ্যেই কাটাতে হল। অবশ্য সিরেনসেন প্রতিদিন নিয়মিত সেই তুষারঝড়ের মধ্যেই বাইরে যেতে থাকল। সে-ই দোকান বাজার করতে থাকল। কুণ্ডা, গোমা ও টারজানের খাওয়ার কোন অসুবিধা হল না।

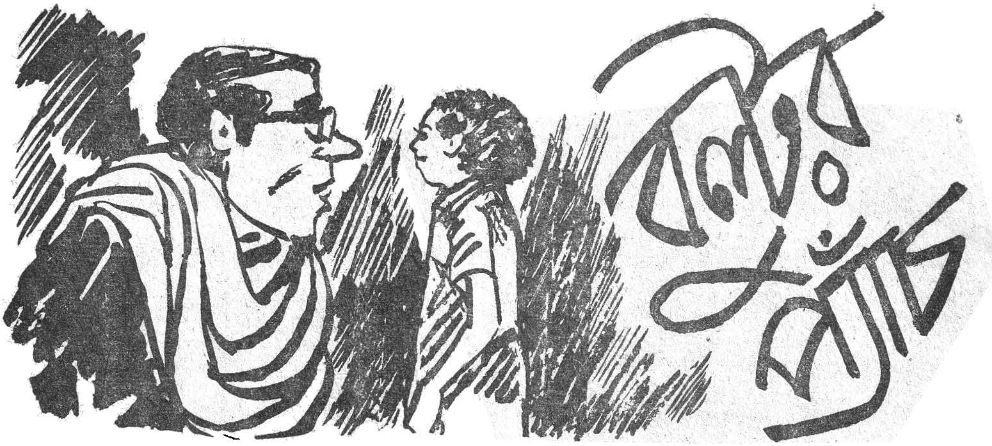
সেদিন ছিল শনিবার। সকাল ৮ টা নাগাদ সিরেনসেন বাইরে বেরিয়ে গেল। বেলা ১২ টায় তার ফিরে আসার কথা। কিন্তু বারোটা কেন, তার পরেও সে ফিরে এল না। কুণ্ডা-গোমা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল।

ঘরে রান্নার কোন জিনিসপত্র নেই। অন্য কিছু খাবারও নেই। দু'চারখানা বিস্কুট ছিল, তা এরিককে দেওয়া হল। সকলে ক্ষিধেয় ছটফট করতে থাকল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হল। সিরেনসেন ফিরল না।

বাধ্য হয়ে কুণ্ডা কিছু কিনে আনতে বাইরে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল।

একটু বাদেই কুণ্ডা কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল। তুষার পড়ে রাস্তা ঢেকে গেছে। কোনো গাড়ি চলছে না। কাছের দোকান সব বন্ধ। দূরে যেতে হবে কিন্তু সে ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে ফিরে এসেছে।

[ক্রমশঃ]



তপেন নিয়োগী

—একটা কথা বলব স্যার ?

বনমালীপুর উচ্চ-বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র বলাইচাঁদ চন্দ ওরফে বল্টু অঙ্কের স্যারের অনুমতি চাইল।

রোগা-পাতলা চেহারা। কাকাতুয়ার চঞ্চুর মতো ধারাল নাক। মাথায় কদমছাঁট চুল। চোখ দুটো বেজায় বড়। সাপের চোখের মতো চকচকে।

মধুবাবু বাঁ হাতে চশমাটা খুলে ডান হাতে কোঁচার খুঁটে কাচ মুছতে গিয়ে ভুরু কোঁচকালেন,

—কথা ? কি কথা বলবে ?

অঙ্কের স্যার মধুসূদন চাকলাদার একাই শুধু বল্টুকে সমীহ করেন যে, তা নয়। ভূগোলের স্যার মুরারীবাবু ছাড়া সব স্যারই বল্টুকে সমীহ করেন।

যেদিন ফাইভে ভর্তি হল বল্টু সেদিনই তার নাম ছড়িয়ে পড়ল সবার মুখে মুখে। ক্লাসের সহপাঠীরা স্তম্ভিত। মাস্টারমশায়রা বিস্মিত। ইংরেজি, ইতিহাস, বাংলা, অঙ্ক, ভূগোল-বিজ্ঞান সব সাবজেক্টগুলো যেন গুলে খেয়েছে। একেবারে জলবৎ তরলং।

ভূগোলের স্যার মুরারীবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন —পশ্চিমবঙ্গে ক'টা জেলা আছে ? বল্টুর চটপট জবাব —ষোলটা।

—কোন্ জেলা সবচেয়ে বড় ?

—চব্বিশপরগণা।

—কোন্ জেলার দুই সীমান্তে দুটো প্রদেশ আর এক সীমান্তে সমুদ্র ?

ক্লাসের কেউ জবাব দিতে পারে নি। মুরারীবাবু বল্টুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি বলতে পারবে ?

—মেদিনীপুর জেলা। বল্টুর সংক্ষিপ্ত জবাব।

—তোমার নাম কি ?

—বল্টু, ভাল নাম বলাইচাঁদ চন্দ। একটু থেমে বল্টুই মুরারীবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল, একটা কথা বলব স্যার ?

—বল।

—সয়েল মানে তো স্যার, মাটি ?

—হ্যাঁ।

—গণ্ডোয়ানা সয়েল মানে কি স্যার ?

মুরারীবাবুর চোখদুটোতে একটা হাসির ঝিলিক খেলে যায়। তারপর বলেন,—অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং মুরারীবাবু বল্টুকে সমীহ করেন না। তাঁর মোক্ষম অস্ত্র হচ্ছে 'অপ্রাসঙ্গিক'। কিন্তু অত্যন্ত নিরীহ ছেলের মতো বল্টু যখন অন্য কোন স্যারকে আবেদন জানায়— 'একটা কথা বলব স্যার ?' তখন মাস্টারমশায়রা কেমন যেন ঘাবড়ে যান। বল্টুর বিদঘুটে প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে ক্লাসের পড়া আর এগোবে না। তাই সেদিন অঙ্কের স্যার মধুবাবুকে যখন সে নিতান্ত গোবেচারার মতোই জানাল—একটা কথা বলব স্যার ?

তখন মধুবাবু চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে করতে নিতান্ত সন্দেহজনক কণ্ঠেই বললেন—কথা? কি কথা বলবে?

ক্লাসের ছেলেরা উৎকণ্ঠিত। তেতাল্লিশ জোড়া চোখ বল্টুকে দেখছে। ক্লাসের ফার্স্টবয় বল্টু অঙ্কের স্যারকে কি কথা বলবে।

মধুবাবু বললেন,—বল, কি বলবে?

বল্টু তার চকচকে চোখজোড়া সারা ক্লাসের ওপর বুলিয়ে নিয়ে বলল,—কথাটা স্যার আমার ব্যক্তিগত।

মধুবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন,—ব্যক্তিগত, মানে প্রাইভেট, অর্থাৎ গোপনে বলতে চাও?

—না স্যার, কথাটা ব্যক্তিগত তবে গোপনীয় নয়।

—গোপনীয় যদি না হয় তবে বলেই ফেল।

—কথাটা স্যার পাপপুণ্য বিষয়ক।

—পাপপুণ্য বিষয়ক? অঙ্কের ক্লাসে পাপপুণ্য বিষয়ক কথা আসবে কেন?

মধুবাবু এবার সত্যিই বিরক্তি প্রকাশ করেন।

স্যারকে বোঝাতে থাকে বল্টু, আপনি স্যার চড়ুইভাতির চার্জে আছেন। আগামী কাল আমরা ঘাটশিলায় চড়ুইভাতি করতে যাচ্ছি। এটাতো ঠিক?

—হ্যাঁ সবই ঠিক। কিন্তু চড়ুইভাতির সঙ্গে পাপপুণ্য বিষয়ক কথার যোগাযোগ কোথায়?

—ভোরবেলা আমাদের নিয়ে রিজার্ভ বাস ছাড়বে?

—হ্যাঁ ভোর ছ'টায় বাস ছাড়বে।

—ঘাটশিলায় পৌঁছে আমরা আটটা নাগাদ টিফিন করবো?

—আটটা থেকে ন'টার মধ্যে।

—দু'টো করে মর্তমান কলা, ডিমসেদ্ধ আর পাঁউরুটি-মাখন থাকছে?

—থাকছে।

—দুপুরের মেনুতে থাকছে মাথাপিছু তিনশো গ্রাম মুরগীর মাংস, গলদা চিংড়ির মালাইকারি, রুই-মাছের মাথাসহ ভাজামুগের ডাল, জলপাইয়ের চাটনী, কড়াপাক সন্দেশ সহযোগে চিনিপাতা দই। ঠিক তো?

—হ্যাঁ ঠিক। সেই জন্যেই তোমাদের কাছ থেকে মাথাপিছু পঁচিশ টাকা করে চাঁদা নেওয়া হয়েছে।

—সেইজন্যেই তো স্যার বলছি, আমি পাপপুণ্য বিষয়ক সমস্যায় পড়েছি।

মধুবাবু ক্রমশ ধৈর্য হারাচ্ছেন।

—তাতে বাবা পাপপুণ্য বিষয়ক সমস্যাটা কোথায়?

—অ্যাণ্টিডোট কাকে বলে জানেন?

—অ্যাণ্টিডোট? অ্যাণ্টিডোট মানে তো প্রতি-ষেধক দ্রব্য বা ওষুধ। তার সঙ্গে পাপপুণ্য বিষয়ক সমস্যার কি যোগাযোগ?

—যোগাযোগ আছে স্যার। দাদু বলেন, এ জগতে এমন কিছু নেই যার সঙ্গে পাপপুণ্যের যোগা-যোগ নেই।

—তবে সমস্যাটা তোমার দাদুকে বলেই সমাধান করে নিও। যত্ত সব...

—কথাটা স্যার আপনাকেই বলতে হবে। আজ যদি আমাকে বলার সুযোগ না দেন তবে পরে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেও বলব না।

মধুবাবু এবার হাল ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন।

—বল। তোমার সমস্যার কথা বল।

বল্টু ধীরে ধীরে তার সমস্যার কথা বলতে থাকে।

—আমি স্যার টিফিন বাক্সে কোনদিন লুচি হালুয়া, কোনদিন মোগলাই পরোটা, আবার কোনদিন ডিমসেদ্ধ, মর্তমান কলা আর কেক আনি।

আমার টিফিন বাক্স খুলে কে বা কারা প্রায়ই ঐ খাদ্যবস্তু খেয়ে ফেলে।

মধুবাবু মুচকি হেসে বলেন—তা কে বা কারা কেমন করে খেয়ে ফেলে?

—আমার ব্যাগে টিফিন বাক্স থাকে। আমি টিফিন পিরিয়ডে ব্যাগ ক্লাস-রুমে রেখে বাইরে যাই হাতমুখ ধুয়ে আসতে। সেই অবসরে কে বা কারা আমার টিফিন বাক্স থেকে খাদ্যবস্তু বের করে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে।

—চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে দেখেছ তুমি?

—না স্যার এটা আমার অনুমান। মোগলাই বা লুচি না চিবিয়ে খাওয়া যায় না।

—না বলে পরের জিনিস নেওয়াকে চুরি করা বলে। মধুবাবু ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং তোমার টিফিন বাক্স থেকে যে খাবার চুরি করে খেয়েছে সে নিশ্চয়ই পাপ কাজ করেছে।

—আমি স্যার তা বলছি না! আমি বলছি যে, আজকে আমি টিফিন করার জন্য হালুয়া আর গাওয়া ঘিয়ে ভাজা সাতখানা লুচি এনেছিলাম। রোজই কিছু বেশি করে খাবার আনি। কারণ আমার পেটুক বন্ধু খাওয়ার পরেও কিছু অবশিষ্ট না থাকলে আমাকে অভুক্ত থাকতে হয়। আজ হালুয়া আর সাতখানা লুচিই খেয়ে ফেলেছে। আমার এতে কতটা পাপ হতে পারে তাই স্যার জানতে চাইছি। আর এর অ্যান্টিডোট কি হতে পারে।

মধুবাবু অবাক হলেন।

—তোমার খাবার যে চুরি করে খেয়েছে পাপ হবে তার। তোমার হবে কেন?

—কিন্তু যে বা যারা আমার আনা লুচি হালুয়া চুরি করে খেয়েছে সে বা তারা যে কাল চড়ুইভাতি করতে যেতে পারবে না। পঁচিশ টাকা করে চাঁদা দিয়ে চড়ুইভাতির মজাটুকুই শুধু নয় কড়াপাক থেকেও বঞ্চিত হবে। এটাই তো সমস্যা।

—কেন, কেন? কেন যেতে পারবে না?

—মরেও যেতে পারে স্যার। অথচ বিশ্বেস করুন স্যার, আমি কাউকে মারতে চাই নি।

—মরেও যেতে পারে? সর্বনাশ। কেন কি হয়েছে?

—আমার স্যার কনস্টিপেশন মানে কোষ্ঠবদ্ধতা আছে। তাই মাঝে মধ্যে জোলাপ খেতে হয়। কাল চড়ুইভাতি করতে যাবো বলেই আজ লুচি-হালুয়াতে মা জোলাপ মিশিয়ে দিয়েছে। মাত্র একপিস খেলে বার তিনেক দৌড়োতে হবে, সাতসকালে উঠেই। সকলের তো স্যার কনস্টিপেশন নেই। তাই বলছিলাম। তাছাড়া কেউ যদি একাই সব খেয়ে থাকে...

—তাহলে? তা হলে কি হবে?

—হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সে ক্ষেত্রে পাপপুণ্য বিষয়ক সমস্যা দেখা দিতে পারে না কি?

মধুবাবুকে চিন্তিত দেখায়। জবাবটা সহজে দিতে পারেন না। আরও যেন কি বলতে যাচ্ছিল বল্টু কিন্তু তৃতীয় বেঞ্চে কান্নার ফোঁসি-ফোঁসানিতে তার আর কথা বলা হল না। ধমকে উঠলেন মধুবাবু—

—এ্যাই তোরা কাঁদছিস কেন রে? দাঁড়া। বাপী, শীতল আর অনন্ত তিনজনে উঠে দাঁড়াল। তিনজনেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

—আমি স্যার খেতে চাই নি। অনন্ত জোর করে খাইয়ে দিল। কাঁদতে কাঁদতে বাপী বলল।

—না স্যার। যখন ফাইভে পড়তাম, তখন বাপীই প্রথম বল্টুর বাক্স থেকে...

মধুবাবুর গর্জনে অনন্তর কথা চাপা পড়ে যায়।

—চোর কোথাকার। তোদের লজ্জা বলতে কিছু নেই। শীতল ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে কি যে বলল কিছু বোঝা গেল না।

বল্টুর চোখে মুখে হাসির ঝিলিক দিচ্ছে। হাসি চেপে কোন রকমে সে বলল—ভয় নেই স্যার, ম্যাগসালফ খেয়ে মানুষ মরে না। তবে গলদা চিংড়ির মালাইকারী, মুরগী মাংস আর...।

আর কোন কথা বোঝা যায় না কারণ বাপী, শীতল আর অনন্তের কান্নার কনসার্ট তখন উচ্চ গ্রামে চলছে।

আলো নিভে গেল

তনুশ্রী মিত্র

পড়াশুনো না করে
রমা লুডো খেলে ঘরে।
বাবা এল বকতে,
মা এল মারতে।

পালাবার পথ নেই,
কী যে করে ঠিক নেই।
হঠাৎ আলো নিভে গেল,
রমা জয়া বেঁচে গেল।

দেবতাদের লুকোচুরি খেলা

অজিতকুমার দাস

[ব্রহ্মদেশের রূপকথার-গল্প]

পৃথিবীর স্রষ্টা ঈশ্বর একদিন আকাশ-দেবতা ও বরুণদেবকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, "যদিও আমি পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তবুও এর উপর কর্তৃত্ব করার ইচ্ছা আমার নেই। তোমরা নিজেরাই ঠিক কর—একজন অথবা দুজনে পৃথিবীর শাসনকার্য পরিচালনা করবে।" দুই দেবতা তখন ঈশ্বরের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তাঁরা এ-বিষয়ে অবশ্যই ভেবে দেখবেন।

বরুণদেব আকাশ-দেবতাকে বললেন, "যেহেতু মানুষ আমারই আরাধনা করে, তাই আমার একারই পৃথিবী শাসন করা উচিত বলে মনে করি।" আকাশ-দেবতা এর উত্তরে নম্রভাবে বললেন, "প্রিয়-বন্ধু, এ-বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। মানুষ তখনই আপনার উপাসনা করে যখন তাদের বৃষ্টির প্রয়োজন হয়। কিন্তু তারা সর্বদাই আমার উপাসনা করে। প্রকৃতপক্ষে, আপনি কেবলমাত্র মেঘ এবং বৃষ্টি-ফোটার আকারে তাদের দৃষ্টি গোচরে আসেন, অথচ আমি সর্বদাই তাদের কাছে দৃশ্যমান। একথা বিস্মৃত হবেন না যে, মানুষ যে পৃথিবীতে বাস করে—আকাশ তার একটি ঢাকনা-স্বরূপ।" বরুণদেব কিছুক্ষণ মনে মনে একথা চিন্তা করলেন। তারপর আবার তর্কে প্রবৃত্ত হলেন। "আমিই সর্বাপেক্ষা শক্তি-শালী"—তিনি এই দাবী করলেন। তিনি আরো বললেন, "আমিই গাছপালা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকি এবং আমি ঝড় অথবা বন্যা সৃষ্টি করে হাজার হাজার বিঘা জমিও অসংখ্য ঘরবাড়ি বিনষ্ট করতে পারি। তাছাড়া আমার হাতের মধ্যেই বজ্র রয়েছে।" আকাশ-দেবতা এর উত্তরে বললেন, "প্রাকৃতিক শৌর্যই কেবল একজন মানুষকে শক্তিশালী করে না। একজন মানুষের বুদ্ধিমত্তা থাকাও প্রয়োজন। একথার যথার্থতা প্রমাণের জন্যে আসুন আমরা আত্মগোপন ও অন্বেষণের খেলা খেলি।" বরুণদেব এতে সম্মত হয়ে খেলা শুরু করার সুবিধার্থে আকাশের দেবতাকে বললেন, "আপনি চোখ বন্ধ করুন।" তিনি তাঁকে আরো বললেন, "এক থেকে দশ পর্যন্ত গণনার পর আপনি আমার অনুসন্ধান করবেন।" বরুণদেব পৃথিবীকে ভেড়ে তার ভিতর আত্মগোপন করলেন। আকাশের-দেবতা দশ পর্যন্ত গণনার পর তাঁর প্রতি-দ্বন্দ্বীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনি দেখলেন, বরুণদেব পৃথিবীর ভিতর ডানদিকে কুণ্ঠিত অবস্থায় রয়েছেন। আকাশের দেবতা তখন চিৎকার করে বললেন, "প্রিয় বন্ধু বাইরে আসুন। আমি খুব ভালো ভাবেই দেখতে পাচ্ছি যে, আপনি কুণ্ঠিত অবস্থায় পৃথিবীর ভিতরে আশ্রয় নিয়েছেন।" বরুণদেব বিহ্বল হয়ে তাঁর লুক্কায়িত স্থান (পৃথিবী) থেকে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, "এবার আপনার আত্মগোপন করার পালা।"

বরুণদেব চোখ বন্ধ করলেন এবং এক থেকে দশ পর্যন্ত গোনার পর পৃথিবীর ভিতরে তাকিয়ে দেখলেন, তিনি আকাশের দিকে তাকালেন এবং সূর্য-চন্দ্র তারকাপুঞ্জের পিছন দিকও দেখলেন। কিন্তু তিনি প্রায় চতুর্দিক অন্বেষণ করেও আকাশ-দেবতার সন্ধান পেলেন না। তাই তিনি চিৎকার করে বললেন, "আকাশের দেবতা, আমি আপনার অনুসন্ধান করতে ব্যর্থ হয়েছি, আমি পরাজিত, সুতরাং দয়া করে আপনি বাইরে আসুন।" আকাশের-দেবতা তাঁর লুক্কায়িত স্থান বরুণদেবের কান থেকে বেরিয়ে এলেন। বরুণ-

দেব তখন হতাশ হয়ে নিজের মনেই বিড়্ বিড়্ করে বলতে লাগলেন, "আমি কি মূর্খ, আমার উচিত ছিল আকাশ-দেবতার ভুরুতে আত্মগোপন করা।" আকাশ দেবতা বললেন, "প্রিয়-বন্ধু, দুঃখ কর না। প্রকৃত পক্ষে, আমিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেবতা, যদি এ-বিষয়ে আপনার কোন সন্দেহ থাকে তাহলে আমাকে লক্ষ্য করুন। তারপর আকাশ-দেবতা মাদুরের মতো পৃথিবীকে পাকালেন এবং তাঁর বাম-কানের সোনার মাকড়িটি খুলে রেখে গুটানো পৃথিবীকে তাঁর কানের গর্তের ভিতরে রাখলেন। তারপর তিনি ঠাট্টা করে বললেন, "আমার মনে হয় ঈশ্বর দুইটি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যাতে আমি দুটি নিখাদ নতুন মাকড়ি পেতে পারি।"

বরুণদেব আকাশ-দেবতাকে বললেন, "আপনিই আমার গুরু, এখন সমগ্র পৃথিবী আপনিই শাসন করুন।" আকাশ-দেবতা গুটানো পৃথিবীকে তাঁর কানের গর্তের ভিতর থেকে বের করার পর আবার প্রসারিত করে বললেন, "আমি এতো লোককে শাসন করতে অক্ষম। আমি শিক্ষিত লোকদের শাসন করব। কারণ তারা বড় কৌশলী। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত—অর্থাৎ যারা সাদাসিধা এবং সৎ-লোক তাদের শাসন করার দায়িত্ব আপনাকে দিলাম।" তিনি আরো বললেন, "প্রিয়বন্ধু, অশিক্ষিত লোকেদের মধ্যে 'কোচিনরা' সর্বাপেক্ষা সাদাসিধা। সুতরাং তাদের নিরাপত্তার দিকে নজর দেবেন।"

এই কারণেই বর্তমানে ব্রহ্মদেশের অধিবাসীরা আকাশ-দেবতা ও 'কোচিন'রা বরুণ দেবের উপাসনা করে থাকেন।

হরবোলা পাখি

পুলক দেবনাথ

তোমরা কোনো কোনো মানুষকে পশু-পক্ষীর ডাক নকল করে শোনাতে দেখেছ নিশ্চয়ই। কিন্তু একটি বিশেষ পাখির মধ্যেও এই অদ্ভুত গুণটি বিদ্যমান। পশু-পক্ষীর ডাক নকল করতে পাখিটি ওস্তাদ। তাই তো পাখিটিকে হরবোলা বলছি। ভূমিকা বাদ দিয়ে এবার পাখিটির নাম বলে ফেলি—পাখিটির নাম 'বাউয়ার'। এদের বাস অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যাণ্ডে। এরা বিভিন্ন ঝোপঝাড়ের পাখির ডাক ও গান, বিড়ালের মিউ-মিউ, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ এবং মানুষের বিভিন্ন শব্দাবলী নকল করতে পারে। এছাড়াও এরা হাতুড়ী মারা বা ঠোকা ও করাত-কাটার মতো শব্দও করতে পারে।

এছাড়াও এদের আরেকটি বিশেষ গুণ আছে—এরা সুন্দর ঘরামি। গাছের গোড়ায় পঞ্চাশ থেকে ষাট সেণ্টিমিটার উঁচু সুন্দর ও সুসজ্জিত বাসা তৈরী করে এরা।—বাসা তৈরীর উপাদান প্রধানতঃ ছোট ছোট ডালপালা, সবুজ শ্যাওলা দিয়ে ঘরের ছাদ দেয়। শুধু ঘর নয়, ঘরের সামনেও তৈরী করে শ্যাওলা দিয়ে একটি সুন্দর মসৃণ ও নরম পুষ্পাচ্ছাদিত অঙ্গন—এখানেই পুরুষ ও স্ত্রী বাউয়ারের বড় খুশীর সঙ্গে খেলে ও নাচে।

তবে পায়রার মতো এদেরও দুটো বড় বড় গোল চোখ আছে, যা সত্যিই সুন্দর ও বিস্ময়কর।



ডানপিটে

(জাপানী উপকথা)

গোপাল দাস

অনেক, অনেক দিন আগে জাপানের এক গাঁয়ে বাস করতো একটি ডানপিটে ছেলে। নাম তার সানকিচি। গরীব আর দুর্বল লোকদের সর্বদা সাহায্য করতো সে। তার ডানপিটেগিরি ছিল দুষ্টু লোকদের সঙ্গে। ফন্দিবাজ লোকদের জব্দ করতে সে ছিল একজন ওস্তাদ।

প্রতিদিনের মত সেদিনও সে বেরিয়েছে পাড়ায় টো টো করতে। বড়ো রাস্তায় পড়তেই দেখলো তারই সমবয়সী একটি ছেলে কাঁদছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

—কী হয়েছে, ভাই, বলোতো আমায়, এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলে সানকিচি।

—এখন বাড়ি ফিরে গেলে বাবা ভয়ানক রেগে যাবে আমার ওপর। মাও মুখ ভার করে বসে থাকবে। বোনগুলো চীৎকার করে শুরু করবে কান্না।

—কেন, কী অপরাধ করেছো তুমি? জিগ্যেস করলে সানকিচি।

—অপরাধ কিছু করি নি আমি।

—তবে? ব্যাপারটা খুলেই বলো না ছাই। এবার সত্যি সত্যি রেগে ওঠে সানকিচি।

—ওরা সবাই ঠকিয়েছে আমায়, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে ছেলেটি।

—ওরা কারা? কেমন করে ঠকালো তোমায়? নরম সুরে বললে সানকিচি।

—ও পাড়ার টাক-মাথা বুড়ো স্যাকরা, ধুমসো মোটা গয়লা আর তিরিক্ষি-মেজাজ জেলে—এরা সবাই। বাবা বন থেকে ধরে এনেছিলো কতকগুলো ঘুঘু আর কাদাখোঁচা পাখি। আমি বেরিয়েছিলুম বিক্রি করতে। যার যেটা ইচ্ছে তুলে নিলে ওরা ঝুড়ি থেকে। পুরো দাম দিলে না কেউ। এতো কম পয়সা দিয়ে চাল কিনবো কেমন করে!

—ওদের চিনি আমি, বললে সানকিচি।—গয়না গড়াতে দিলেই ওই বুড়ো স্যাকরা চুরি করবে সোনা। ওই মোটা গয়লা দুধে জল মেশাবেই মেশাবে। আর ওই রগচটা জেলে মাছের ওজন কম দেবেই দেবে। ওদের সবাইকেই মজা দেখাচ্ছি আমি।

একটুখানি ভেবে নিলে সানকিচি। তারপর বললে ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে,—তোমার বাবাকে বলো চল্লিশটা কাক আর দুটো কাদাখোঁচা পাখি ধরে দিতে। ওগুলো নিয়ে কাল সকাল বেলা ঠিক এমনি সময় এখানে দেখা করবে আমার সঙ্গে। ওই কাক বেচে পয়সা এনে দেবো তোমাকে।

—কাক! কাক বিক্রি করে ক'পয়সা পাবে তুমি? অবাক হয়ে বললে ছেলেটি।

—সে সব ভাবতে হবে না তোমাকে, গম্ভীর হয়ে বললে সানকিচি।—তোমাকে যা বলছি তা-ই করোতো আগে।

দুই

পরদিন ঠিক সময়েই ছেলেটি নিয়ে এলো চল্লিশটি কাক আর দুটো কাদাখোঁচা।

কাকগুলো সমান দুভাগে ভাগ করে দুটো ঝুড়িতে রাখলো সানকিচি। একেক ঝুড়িতে থাকলো কুড়িটি করে কাক। আর প্রতি ঝুড়িতে একটি করে কাদাখোঁচা। কাকগুলোর একেবারে ওপরে থাকলো কাদাখোঁচা দুটো। একটা বাঁকের দুদিকে ঝুলিয়ে নিলে ঝুড়ি দুটো। তারপর ওই বাঁক কাঁধে নিয়ে সানকিচি বেরুলো ফেরি করতে।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হাঁক দিচ্ছে সানকিচি,— কাক চাই, কাক?

—ওহে কাকওলা, এসো এদিকে, ডাক দিলে স্যাকরা বুড়ো। ছেলেটা দেখছি একেবারেই বোকা, স্যাকরা ভাবলে মনে মনে। কাক আর কাদাখোঁচা চেনে না ভালো করে। কাকের দাম দিয়ে নেয়া যাবে কাদাখোঁচা। বেশ দাঁও মারবো আজকে।

সানকিচি তার সামনে নামিয়ে রাখলো ঝুড়ি দুটো।

—একটা কাকের দাম কতো পড়বে, হে ছোকরা? জিগ্গেস করলে স্যাকরা।

—সত্তর ইয়েন, উত্তর করলে সানকিচি।

—বড্ড দাম বলছো যে! ষাট ইয়েন দেবো, দেখো।

—আচ্ছা, তাই দিন, বললে সানকিচি।

একটি একটি করে ষাট ইয়েন প্রথমে সে গুণে নিলে নিজের হাতে। তারপর স্যাকরা যেমনি ঝুড়ি থেকে কাদাখোঁচা তুলতে যাচ্ছে অমনি বাধা দিলে সানকিচি।

—আপনি তো কিনেছেন একটা কাক। তাই দিচ্ছি আপনাকে। বলেই তার হাতে তুলে দিলে একটা কাক।

স্যাকরার মুখে রা নেই। বড্ড শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছে সে। একটা কাক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো তাকে।

তিন

—কাক চাই, কাক? বাঁকটা কাঁধে তুলে নিয়ে আবার হাঁক দিয়ে চললো সানকিচি।

সেই মোটা গয়লাও এগিয়ে এলো। ভাবলো বেশ ফাঁকি দিয়েই নিয়ে নেবে কাদাখোঁচা। ছেলেটা নিশ্চয়ই হাবা। তা নইলে কাদাখোঁচাকে কাক বলে বিক্রি করে কেউ!

—এই নাও ষাট ইয়েন। আমি নিজেই একটা কাক তুলে নিচ্ছি ঝুড়ি থেকে।

সানকিচি দামটা ঠিকই বুঝে নিলে। কিন্তু গয়লাকে হাত দিতে দিলে না ঝুড়িতে। গয়লার নজরটা যে কাদাখোঁচার দিকে তা সে বেশ বুঝতে পেরেছিলো। তাই তাড়াতাড়ি গয়লার হাতে তুলে দিলে একটা কাক।

গয়লা তো একেবারে থ। ফাঁকি দিতে গিয়ে নিজেই পড়ে গেলো ফাঁকে। কাক না নিয়ে এখন উপায় কী তার।

চার

—কাক চাই, কাক? সানকিচি এসে পড়েছে জেলেপাড়ায়।

সেই তিরিক্ষি-মেজাজ জেলে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। দেখতে পেলো কাকের ঝুড়িতে রয়েছে কাদাখোঁচা। ভাবলে কাকের দাম দিয়ে কাদাখোঁচাই নিতে পারবে সে। বেশ ঠকানো যাবে ছেলেমানুষকে। রোজ রোজ মাছ খেতেও আর ভালো লাগছে না। কাদাখোঁচার মাংস খেতেও লাগবে চমৎকার।

—ওহে ছোকরা, তোমার কাকের দাম কতো?

—ষাট ইয়েন, বললে সানকিচি।

বেশ তা-ই দেবো আমি, বলেই জেলে ঝুড়ি থেকে তুলতে যাচ্ছে কাদাখোঁচা।

তাড়াতাড়ি ঝুড়িটা সরিয়ে নেয় সানকিচি।

—আমাকে দামটা দিন আগে।

ষাট ইয়েন আদায় করে নিলে সানকিচি। তারপর জেলের হাতে তুলে দিলে একটা কাক।

—আপনি তো কিনেছেন একটা কাক। কাদা-খোঁচার দিকে হাত বাড়াচ্ছেন কেন মিছিমিছি ?

জেলে বোকা বনে গিয়ে কাক নিয়েই সরে পড়লো সেখান থেকে।

এমনি করেই দুপুর না হতেই সবগুলো কাকই বিক্রি করে ফেললো সানকিচি। কাদাখোঁচা দুটোই শুধু পড়ে রইলো ঝুড়িতে।

সানকিচি তখন ফিরে এলো ছেলেটির কাছে।

—বাড়ি নিয়ে যাও এই কাদাখোঁচা দুটো। মাংস রান্না করে খাবে সবাই। আর এই নাও কাক বিক্রির সব পয়সা। চাল কিনবে এই দিয়ে।

অতো পয়সা পেয়ে ছেলেটির বাবা ছেলের পিঠ চাপড়ে আদর করলেন খুব। মা চুমো খেলেন গালে। আর বোনেরা আনন্দে দিতে লাগলো হাততালি।

সানকিচির কাছে জব্দ হবার পর ওখানকার লোকেরা ছোট ছেলেদের ঠকাবার চেষ্টা করে নি আর কখনো। *

* জাপানী উপকথা অবলম্বনে।

যে মাছ ডাঙায় ওঠে

গোপালচন্দ্র দে

মাছদের মধ্যে স্পিণ্ডল নামে এক ধরনের মাছ আছে যারা অন্যান্য মাছের মত সারাক্ষণ জলে বাস করে না। সাধারণতঃ এরা দিনের বেলায় জল থেকে উঠে এসে ডাঙায় বিশ্রাম করে এবং সন্ধ্যায় আবার জলে নেমে যায়। মৎস্যবিজ্ঞানীরা বলেছেন, জলের তলায় অদ্ভুত জাতের এই মাছগুলির শরীরে অত্যধিক তাপ বেড়ে যায়। ফলে ওদের পক্ষে তখন জলে বাস করা কষ্টকর হয়ে ওঠে।

অবশ্য চলাফেরার ব্যাপারে ওদের কোন পা নেই। শুধু কানকোতে ভর দিয়ে এরা হেঁটে বেড়ায়। উত্তর আমেরিকার উপকূলবর্তী জলাশয়ে এই মাছগুলিকে বেশির ভাগ দেখতে পাওয়া যায়। এরা আমাদের দেশের কই মাছের মত দেখতে। কই মাছের মামাতো পিসতুতো ভাইও এদের বলা যায়।

হামুরাবির অদ্ভুত আয়না

নারায়ণ চক্রবর্তী

যেমন পড়াশোনায়, তেমনি খেলাধুলোয়, দুটোতেই চৌখস পুণ্টু। এবারও কুলটি স্কুলে ফার্স্ট হয়ে ক্লাস টেনে উঠেছে, একগাদা বই পেয়েছে প্রাইজে, তার ভেতরে এইচ. জি. ওয়েলস্-এর আউট লাইন হিস্ট্রি অব্ দ্য ওয়ার্লড্ও আছে। আবার স্কুলের ফুটবল টিমেরও ক্যাপ্টেন সে। পড়ার বই ছাড়াও ওর প্রফেসর কাকার আলমারি থেকে দারুণ দারুণ সব বাইরের বই পড়ে নিজের জ্ঞানভাণ্ডারটিকেও বেশ বাড়িয়ে তুলেছে সে। একটামাত্র দোষ ওর, খুব একটা মিশুক নয়, একটু গভীর, গম্ভীর, একা থাকতেই বেশী ভালোবাসে। একা থাকে, আর একা ভাবে। ওর ভাবনা-চিন্তার জাতই আলাদা।

জুলাই মাসের শেষ শনিবার। কুলটি ফুটবল স্টেডিয়ামে ম্যাচ খেলে বাড়ি ফিরছিল পুণ্টু। একা। ডিসেরগড় স্কুলকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিতে পেরেছে ব'লে দারুণ খুশী সে আজ, আরও খুশী ঐ তিনটি গোলের ভেতরে একটি গোল সে নিজে দিয়েছে বলে। সবাই বলেছে দর্শনীয় গোল।

সূর্য পাটে বসেছে, চারিদিক জুড়ে নেমেছে গা ছমছম আঁধার, বিশাল গলফ খেলার মাঠ জুড়ে আবছা অন্ধকার। লোকজন বিশেষ কেউ নেই, ফুরফুরে হালকা হাওয়া দিচ্ছিল, সে হাওয়ায় পুণ্টুর ঘামে ভেজা জার্সি প্যাণ্ট শুকিয়ে আসছিল। একফালি চাঁদ ওর সঙ্গে সঙ্গেই আসছিল। ক্লাব রোডের দু'পাশে বড় বড় গাছ, হালকা হাওয়ায় পাতারা নাচছিল। মার্কারি ল্যাম্পের আলোয় চওড়া কালো রাস্তাটা চক্-চক্ করছিল।

বাড়ির কাছাকাছি এসে মাঠে নামল পুণ্টু। পায়ের নীচে বৃষ্টি-পাগল সতেজ ঘাস। দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে থেমে গেল সে। বাঁ দিকে ঘাসের ভেতর কী যেন চকচক করে উঠলো না? ছুটে গিয়ে ঝুঁকে দেখল চওড়া ফ্রেমে আঁটা ডিমের আকারের একটি ছোট্ট আয়না আকাশের মুখ দেখছে। ফ্রেমে আর কাচে ধুলো-মাটি জমেছে, তবু চাঁদের আলো প্রতিফলিত করছিল আয়নাটা।

আয়নাটা যেন কী এক দুর্বার আকর্ষণে তাকে ডাকছিল, কার আয়না, কেন পড়ে আছে, এসব না ভেবেই সেটা তুলে নিল পুণ্টু। ছোট্ট হলে কী হবে, বেশ ভারী। পকেটে পুরতেই প্যাণ্টটা নীচের দিকে ঝুলে পড়ল।

বাড়ি ফিরে বাথরুমে ঢুকে বেশ ভালো করে চান করল পুণ্টু, তারপর বেশ ভালো করে আয়নাটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতেই আয়নার ফ্রেমটা জেল্লা দিয়ে উঠলো। কাচও ঝকঝক করতে লাগলো। ফ্রেমটা প্রায় দুই ইঞ্চি চওড়া, আধ ইঞ্চি মোটা আর আগাগোড়া সোনার। ফ্রেমের গায়ে নানা ধরনের মূর্তি খোদাই করা। এত নিখুঁত যে মনে হচ্ছিল ওরা যেন জীবন্ত। ফ্রেমের মাথায় সিংহাসনে বসা একটি বলিষ্ঠ পুরুষ। মাথায় বিচিত্র শিরস্ত্রাণ, পরনের পোশাকটিও অদ্ভুত ধরনের। মুখে বেশ লম্বা দাড়ি। চোখ দুটি টানা টানা, হাত বাড়িয়ে একটি বই ধরে আছেন। তাঁর সামনেই মাথায় গোল শিরস্ত্রাণ-পরা আকর্ণবিস্তৃত-চোখ এক বিরাট পুরুষ দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখেও লম্বা দাড়ি, আলখাল্লার মতো বিচিত্র পোশাক। মূর্তি দুটি খুব চেনা চেনা বলে মনে হ'ল পুণ্টুর। ফ্রেমের বাকী অংশ জুড়ে আরও অনেক মূর্তি আর অচেনা অক্ষরে কিছু লেখা।

খাঁটি সোনার ফ্রেম? তাই আয়নাটা এত ভারি। ভীষণ দামীও নিশ্চয়। সাংঘাতিক পছন্দ হয়ে গেল পুণ্টুর। ধরতে গেলে একটা গুপ্তধনই পেয়ে গেছে সে। মা-বাবাকে দেখাবে? দিদিকে, কাকাকে? বেশ ভাবনায় পড়ে গেল পুণ্টু। শেষটায় ঠিক করল

যে, পরদিন চুপি চুপি কাকাকে দেখাবে সোনার আয়নাটা।

রাত্রিতে আয়নায় মুখ দেখতে নেই জেনেও পড়ার ঘরে এসে আয়নায় উঁকি দিল পুণ্টু। কিন্তু কোথায় তার মুখ? প্রথমে ঘন কুয়াশা, তারপরে একটু একটু করে কুয়াশা কেটে দেখা দিল বিশাল রাজপ্রাসাদ, চারিদিকে বিচিত্র পোশাক আর শিরস্ত্রাণ-পরা লোক-জনের ব্যস্ত আনাগোনা, হাতে তাদের চকচকে বর্শা। সিংহাসনে বসে আছেন ফ্রেমের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি। চোখের দৃষ্টি কি স্নিগ্ধ আর কোমল! শিরস্ত্রাণের মণি-মাণিক্যগুলো কী ভীষণ উজ্জ্বল! এবার আর চিনতে দেরী হল না পুণ্টুর। সম্রাট্‌ হাম্‌বুরাবি! আর ফ্রেমের লেখাগুলো আসলে হায়রোগ্লাইফিক হরফ। বানমুখো লেখার ভঙ্গী দেখে আগেই চেনা উচিত ছিল তার।

ছুটে ওর কাকার আলমারি থেকে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা আর অন্য কয়েকটি প্রাচীন ইতিহাসের বই বার করে নিয়ে এলো পুণ্টু, উত্তেজিতভাবে কাঁপা আঙুলে পাতা ওল্টাতে লাগলো। হ্যাঁ, এই যে। ব্যাবিলনের রাজা সিন-মুবালিট-এর ছেলে বিখ্যাত নৃপতি হাম্‌বুরাবি রাজত্ব করেছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব ২১২৩ থেকে ২০৮১ পর্যন্ত। সূর্যদেবতা সামাস নিজের হাতে হাম্‌বুরাবিকে আইনগ্রন্থ তুলে দিয়েছিলেন, সেই দানের ছবিই উৎকীর্ণ হয়ে আছে ফ্রেমের মাথায়। ঐ গ্রন্থে ছিল ২৮৫টি ধারা। স্বর্গের দেবতা আনু আর মর্ত্যের দেবতা বেল তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন ব্যাবিলন রাজ্যে ন্যায়-বিচারের প্রতিষ্ঠা করতে। একাজে পুরো-পুরি সফল হয়েছিলেন বলেই এত নাম হাম্‌বুরাবির।

বই পড়ে তাক লেগে গেল পুণ্টুর। তবে কি চার হাজার বছর পরে প্রাচীন ব্যাবিলনের যুগের এক মায়াবী আয়না কুড়িয়ে পেয়েছে সে। কিন্তু আয়নার কাচে তার মুখের বদলে হাম্‌বুরাবির প্রতিচ্ছবিই বা ফুটে উঠছে কেন? বই তুলে রেখে আবার আয়নার ভেতরে তাকালো সে।

অবাক অবাক অবাক। হামবুরাবির মুখ মুছে গেছে, ফুটে উঠেছে নতুন ছবি। বিরাট দৈত্যের মতো একটি ধূম্র-পাহাড়। তার তুঙ্গ শিখর খাড়াভাবে উঠে গেছে আকাশের দিকে। অনেক উঁচুতে বিশাল বিশাল শিলালিপি। পুণ্টু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে এমন সময়ে কে যেন ফিসফিস করে তার কানের কাছে বলল, —"ওটা ইরানের বাহিস্তান পাহাড়ের শিলালিপি। সম্রাট্‌ দারায়ুস-এর জীবনের আর যুদ্ধজয়ের ইতিহাস নিয়ে লেখা। মাটি থেকে ৩০০ ফুট ওপরে ২৫ ফুট উঁচু আর ৫০ ফুট চওড়া এই শিলালিপি পারসীক, ব্যাবিলনীয় আর সুসান ভাষায় উৎকীর্ণ। এই লেখার সঠিক পাঠোদ্ধার করেছিলেন স্যার হেনরি রলিনসন ১৮৩৭ সালে।

চমকে পড়ার ঘরের চারদিকে তাকালো পুণ্টু। কই, কেউ তো নেই কোথাও। পড়ার ঘরে সে তো একা! তবে কি ঐ ভুতুড়ে আয়নাটাই কথা বলছিল? গা ছমছম করে ওঠে পুণ্টুর। আবার আয়নার দিকে তাকায়। মিলিয়ে গেছে বাহিস্তান-পাহাড়, ফুটে উঠেছে বিশাল এক সমাধিক্ষেত্র। মাটির নীচে কাঁচা ইঁটের তৈরী সৌধ, ভেতরে বড় বড় চারটি ঘর। আবার কে যেন তার কানের কাছে গুঞ্জন করে উঠলো, "চেয়ে দেখ প্রাচীন সুমেরীয় সাম্রাজ্ঞী সুব-আদ আর তাঁর স্বামীর সমাধি। মিশরীয় ফেরোদের মতো অত জমকালো না হলেও ঘরবোঝাই কত সোনা-দানা ধন-দৌলত দেখ।"

এবার আর ততটা চমকালো না পুণ্টু অশরীরী কণ্ঠস্বর শুনে, নিবিষ্ট-চিত্তে আয়নার দিকেই তাকিয়ে রইলো, লক্ষ্য করল যে সমাধি-কক্ষে ঢুকবার মুখেই সারি দিয়ে শোয়ানো ৮৬৮টি মেয়ে পুরুষের কঙ্কাল। সম্রাজ্ঞীর দাস-দাসী ছিল ওরা। ওদের মাথায় গলায় সোনার বিচিত্র গয়না, কানে মাকড়ি, দুল। একটি সোনার মুকুট-পরা মেয়ের হাতে একটি বীণা। সমাধি-ক্ষেত্রে ঢুকবার রাস্তার ওপরে একটি রথ, তার দু'পাশে দুটি সিংহের মূর্তি। রথের চূড়াতেও সোনা-রুপায় তৈরী ষাঁড় আর সিংহ। চারদিকে সে যুগের নানান ধরনের অস্ত্র, সোনা আর তামার পাত্র, পাথরের বাটি...

দোরগোড়ায় এসে মা ডাকলেন,—"এই পুণ্টু, খাবি না? সবাই বসে আছে খাবার টেবিলে। কারখানায় দশটার ভোঁ পড়ে গেছে।"

"যাই মা—" বলে চট করে সোনার আয়নাটা লুকিয়ে ফেলল পুণ্টু।

মা-বাবা, কাকা-দিদির সঙ্গে খেতে বসল বটে,

কিন্তু পুণ্টুর মন তখনও প্রাচীন সুমের, ব্যাবিলন, আসিরীয় যুগেই ঘোরাফেরা করতে লাগল।

পুণ্টুকে অন্যমনা দেখে ওর বাবা বললেন, 'আজ এত গম্ভীর কেন রে তুই ? কী ভাবছিস এত ?'

ফশ্ করে পুণ্টুর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, —"ভাবছি হামুরাবি, গিলগামেশ, নেবুকাডনেজার আসুরবানিপালের কথা—"

ওর কথা শুনে মা-বাবা, কাকা, দিদি, সববাই অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রাত্তিরে আয়নাটা বালিশের নিচে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল ক্লান্ত পুণ্টু। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নানান বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখল। তার মনে হ'ল কারা যেন তার বিছানার চারপাশে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে আর তার দিকে ভ্রূকুটি করে তীব্র দৃষ্টি হানছে। ঘুমের ভেতরেই সে বুঝল যে, এঁদেরই প্রতিকৃতি খোদাই করা আছে আয়নার সোনার ফ্রেমে। এঁরা সবাই প্রাচীন সুমের, ব্যাবিলন বা আসীরীয়দের দেবতা। ডান দিকে তাকিয়ে পুণ্টু দেখতে পেল শকুনিস্তম্ভে উৎকীর্ণ লাগাসের মায়াবী দেবতা নিন গিরসু-কে। বিশাল শরীর তাঁর, মুখে লম্বা দাড়ি, পটলচেরা চোখ। তাঁর এক হাতে মস্ত বড় জাল, অন্য হাতে গদা। লাগাসের শত্রুদের তিনি বেড়াজালে আটকে গদাঘাতে তাদের মাথা ভাঙছেন। পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর পত্নী বাউ। এঁদের পরেই দাঁড়িয়েছিলেন দেবী নানসে। তাঁর পাশে জলদেবতা এনকি আর পৃথিবী দেবী নিনহোরসাগা। তাঁদের পরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা উদ্ভিদের দেবী নিনসার, উটু, সৃষ্টির দেবতা আনু ও এনলিল। এঁরা সবাই সুমেরীয় পুরাণের দেব-দেবী। এঁদের কেউ কেউ আবার ব্যাবিলনীয় বা আসিরীয় সভ্যতার যুগেও পুজো পেতেন।

পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল পুণ্টু, সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন ব্যাবিলনের পৌরাণিক দেবদেবীরা। প্রথমেই দেবতা বেল-মারদুক, সঙ্গে বাহন ড্রাগন। তাঁর মাথায় স্বর্ণ-মুকুট, মুখে লম্বা দাড়ি গোঁফ, বিশাল চোখ। ইনিই স্থিতির দেবতা। তাঁর পাশে ছিলেন লয়ের দেবতা ঈয়া। বাঁ দিকে তাকালো পুণ্টু, সেখানে আসীরিয়ার দেব-দেবীদের মৌন সমাবেশ। প্রথমেই দেবী ইসতার, তাঁর পাশে আদাদ-দেব। সব দেবতারাই পুণ্টুর ওপর এত রেগে গিয়েছিলেন যে তাঁদের চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছিল। সেই আঁচ লেগে ঘুম ভেঙ্গে গেল পুণ্টুর।

জেগে চোখ মেলে দেখে স্বপ্ন নয়, সব সত্যি। সত্যিই আয়নার সোনার ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এসেছেন প্রাচীন ইতিহাসের দেব-দেবীরা, চোখ পাকিয়ে কটমট করে পুণ্টুর দিকে তাকাচ্ছিলেন তাঁরা, যেন রাগে গরগর করছেন। ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল পুণ্টুর। আয়নার ফ্রেম থেকে কী করে বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা! কেনই বা এসেছেন, অত রেগে গেছেনই বা কেন ?

সেই অশরীরী ফিসফিস স্বরে বলতে লাগল, "তুমি হামুরাবির আয়নাটা নিয়ে এসেছ বলে দারুণ রেগে গেছেন সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয়ের দেবতা আনু, বেল আর ঈয়া। অন্য দেবদেবীরাও ব্যাপারটা পছন্দ করছেন না, তাঁরা আয়নাটা ফিরে পেতে চান, তাই হাজার হাজার বছর পরে সোনার ফ্রেমের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। আয়নাটা দিয়ে দাও—দিয়ে দাও —দিয়ে দাও……"

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো পুণ্টুর, বালিশের তলা হাতড়ে আয়নাটা বার করে আনলো, অমনি তার চারপাশে ভিড় করা সেই সব দেব-দেবীরা চোখের পলকে আবার সোনার ফ্রেমের মূর্তিগুলোর ভেতরে ঢুকে গেলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আয়নাটা চোখের সামনে এনে তার ভেতরে তাকিয়ে দেখল পুণ্টু। বাঁকা চাঁদের আলো জানালার গ্রিল দিয়ে গলে ঘরের ভেতরে ঢুকেছিল। সেই আলোতে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেল পুণ্টু। আয়নায় ফুটে উঠেছে অপূর্ব কারুকার্যময় একটি বিশাল তোরণ। তার মস্ত প্রাচীরে এনামেলকরা ইঁটের ওপর বিরাট বিরাট আকারের সিংহ, ষাঁড়, মকর এবং আরও অনেক জীবজন্তুর ছবি প্রাচীরের গা থেকে তোরণ-চূড়া পর্যন্ত আঁকা। কানের কাছে অবার সেই ফিসফিস আওয়াজ ভেসে এলো: "এর নাম ইসতার-তোরণ। খ্রীষ্টপূর্ব ৬০৪ থেকে ৫৬১ তক ক্যালডানিয়ানের রাজা ছিলেন বিখ্যাত নৃপতি নেবুকাডনেজার। অবিস্মরণীয় কীর্তি। ঐ যে সব জীবজন্তুর ছবি দেখছ, ওখানে আছে মোট ৫৭৫টি ছবি। এটিই ছিল ব্যাবিলন নগরে ঢুকবার প্রধান

তোরণ। এবার দেখ পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি,—ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান।"

আয়নায় ইস্‌তার-তোরণের ওপারেই ফুটে উঠলো নগর-দেবতা মারদুকের মন্দিরের বিশাল চূড়া। তার সামনেই আকাশ-ছোঁয়া প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ। ইস্‌তার-তোরণ থেকেই বাঁকা চাঁদের মতো বিশাল খিলানের সারি ধাপে ধাপে উঠে রাজপ্রাসাদের বিশাল ছাতে গিয়ে মিশেছে। সেই ঢালু খিলানের সারিতে পুরু করে পলি মাটি ফেলে লাগানো হয়েছে দেশ-দেশান্তর থেকে আনা হাজার রকমের গাছ, লতা, গুল্ম। ফুলে পাতায় ছাওয়া ছায়াচ্ছন্ন এই ঝুলন্ত বাগানের সম্রাট্ নেবু-কাড্‌নেজ্‌জারের পাট-রাণী তাঁর সখী সহচরীদের নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। চারিদিকে যেন রূপের হাট বসে গেছে।

ঐ আশ্চর্য বাগানে যাবার জন্য ভীষণ ইচ্ছা হ'ল পুণ্টুর। বিছানা থেকে উঠতে যাবে এমন সময়ে আলো কমে গেল, আয়না থেকে সব ছবি মুছে গেল। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল যে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। বাঁকা চাঁদ চলে গেছে মেঘের আড়ালে। অঝোর ধারে বৃষ্টি নামল। খুব মন খারাপ হয়ে গেল পুণ্টুর। আয়নাটা বালিশের পাশে রেখে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে শেষটায় আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে আয়নাটা নেই। নেই তো নেই,—কোথাও নেই! ঘরের দরজা তো ভেতর থেকে খিল দেওয়া, তা হ'লে কে নিল হামবুরাবির ঐ অদ্ভুত আয়নাটা।

কান্না পেতে লাগলো পুণ্টুর। আনু-বেল-ঈয়ার ওপর ভীষণ রাগও হ'ল। ও'রাই কি নিয়ে গেছেন অবাক আয়নাটা?

সূর্য ক্রমান্বয়ে ছোট হচ্ছে

সলিলকুমার বসাক

সূর্য ক্রমান্বয়ে ছোট হচ্ছে? প্রতিবছর সূর্যের পরিধি ১৮ মাইলের বেশী করে সংকুচিত হয়ে পড়ছে। খ্যাতনামা মার্কিন সৌর বিশেষজ্ঞ জ্যাক এডি ব্রিটেনে সংরক্ষিত সূর্যের ২ শত বছরের বিভিন্ন রেকর্ড পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন নিকট ভবিষ্যতে সূর্য নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এখনো সূর্যের পরিধির আয়তন হচ্ছে ৮ লাখ ৬৫ হাজার ৪শ মাইল। তবে তিনি বলেন, সংকুচিত সূর্য পৃথিবীর আবহাওয়ায় কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা নিশ্চয় ভাবে বলা যাচ্ছে না।

একটা কম্পিউটারের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ চালানোর পর জ্যাক এডি যে হিসাব করেন তাতে দেখা যায় ন্যূনপক্ষে ৪শ বছর আগে থেকে সূর্য সংকুচিত হয়ে আসছে। এডির ধারণা কেবলমাত্র সূর্যের বহিঃস্তরেই সংকোচন ঘটছে। অভ্যন্তরীণ এলাকার কিছু হচ্ছে না।



হবুচন্দ্রের স্বপ্ন

সরল মুখোপাধ্যায়

মাঝ রাত। রাজা হবুচন্দ্র বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। মুখে বেশ একটা পরিতৃপ্তির শান্ত হাসি। স্বপ্ন দেখছেন—তিনি যেন একটা আজব জীবে পরিণত হয়েছেন।—শুয়োরের মতো ভোঁদকা দেহ, গায়ে সজারুর মতো কাঁটা, মুখটা কিন্তু কাকাতুয়ার মতো। তিনি যেন দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভায় একটি দাঁড়ে উল্টো করে ঝুলে দোল খাচ্ছেন। চারপাশে দেবতারা তাঁকে দেখে হাসছেন। কেউ মাঝে মাঝে এসে পালক দিয়ে কাতুকুতু দিয়ে যাচ্ছেন। আর তিনি এতে খুব মজা পেয়ে হাসছেন। চারপাশে অপ্সরাগণ তাঁকে দেখে খুব মজা পাচ্ছে। এই স্বপ্ন দেখে হবুচন্দ্র ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছেন ফিচিক ফিচিক করে। এমন সময় বেড়ালের বিশ্রী আওয়াজ। ঘুম ভেঙে গেল তাঁর—স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। প্রথমেই ভীষণ রাগ হয়ে গেল তাঁর নিজের ওপর। তিনি একজন রাজা, তাঁর মতো বুদ্ধিমান সারা রাজ্যে আর নেই। আর তিনি কিনা এই রকম একটা বিদঘুটে স্বপ্ন দেখলেন! রেগে গিয়ে প্রথমেই তিনি নিজের গালে সজোরে একটি চড় হাঁকরালেন। তারপর ডান হাতে নিজের ডান কানটা পাকড়ে নিজেকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালেন আয়নায় সামনে। কানে আচ্ছাসে মোচড় দিতে দিতে বাঁ হাতের তর্জনী তুলে বলতে লাগলেন—আর কখনো এরকম স্বপ্ন দেখবি? বল—বল?

চোখ দুটো রাগে যতই গোল্লা গোল্লা হয়ে উঠছে মোচড়ও তত জোর হচ্ছে। মোচড়ের পর মোচড়—একেবারে রাম-মোচড়। কিছুক্ষণ এই রকম দিতে দিতে রাজার গোঁফ জোড়া ঝুলে পড়ল, গাল ভেটকে গেল, রাজা কেঁদে ফেললেন: ফোঁৎ ফোঁৎ ভ্যাঁ—

সকালে রাজার নাপিত এল প্রতিদিনের মতো রাজার দাড়ি কামিয়ে দিতে। গালে সাবান-টাবান দিয়ে ডান গালে ক্ষুরটা টানবার জন্যে যেই বাঁ হাতে রাজার ডান কানটা ধরেছে অমনি রাজা উ-হু-হু করে উঠলেন। নাপিত চমকে গেল। আর একটু হলেই ক্ষুরটা গালে বসে যাচ্ছিল আর কী? নাপিত শুধোল—কী হয়েছে মহারাজ?

নাপিতদের সঙ্গে রাজাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

থাকে। রাজারা অনেক গোপন কথা নাপিতকে অকপটে বলে থাকেন। রাজা হবুচন্দ্রও বললেন তাঁর রাতের বৃত্তান্ত।

সব শুনে নাপিত বলল, স্বপ্ন দেখায় তো আপনার দোষ নেই মহারাজ। কেন শুধু শুধু নিজেকে শাস্তি দিলেন? নিশ্চয়ই কাল খাওয়ার কিছু গণ্ডগোল হয়েছিল। সুতরাং দোষ তো পাচকের।

রাজসভায় বসে রাজা পাচককে ডাকালেন এবং বললেন—কাল রাত্রে আমি একটা উদ্ভট বাজে স্বপ্ন দেখেছি। নিশ্চয়ই তোমার রান্নার কোন গণ্ডগোল ছিল। তোমার হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড।

পাচক হাত জোড় করে বলল—মহারাজ, রান্না আমার ঠিকই ছিল, কিন্তু নিশ্চয়ই দৈ-এ কোন গণ্ড-গোল ছিল। তাই খাবারগুলো হজম হয় নি। আর তাই আপনি বাজে স্বপ্ন দেখেছেন। সুতরাং দোষ গয়লার।

ডাকা হল গয়লাকে। গয়লা বলল—মহারাজ, দৈ আমি ঠিক মতোই পেতেছিলুম! তবে কাল দৈ নিয়ে আসার সময় পথে একটা ঘটনা ঘটে। তার জন্যে গণ্ডগোল হতে পারে।

—কী ঘটনা?

—কাল যখন দৈ নিয়ে আসছিলুম, তখন পথে রামু ধোপার সঙ্গে দেখা। সে তার গাধার পিঠে কাপড়ের বোঝা চাপিয়ে আসছিল। তা রামুর সঙ্গে কথা বলছি। এমন সময় গাধাটা এমন বিশ্রী ভাবে লাফিয়ে ওঠে যে আমি ভয় পেয়ে চমকে উঠি। এতে আমার মাথার হাঁড়ির দৈ নড়ে যায়। সে জন্যে গণ্ডগোল হতে পারে। সুতরাং দোষ রামুর গাধার।

রাজার হুকুমে ধরে আনা হল গাধাকে। রাজা তাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। কিন্তু সে কোন উত্তরই দিল না। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল! রাজা ভীষণ রেগে গিয়ে হুকুম দিলেন—ফাঁসি। কিন্তু জল্লাদ ভীষণ কান্নাকাটি করতে লাগল যে—গাধার ফাঁসি সে দিতে পারবে না।

তখন ডাকা হল রামুকে। রামু বলল—হ্যাঁ মহারাজ আমার গাধাটা আচমকা লাফিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তার কারণও আছে।

—কী কারণ?

পরশু দিন সকাল বেলা আমার গাধাটা বিখ্যাত গায়ক কোকিলকণ্ঠ গীতিব্রহ্মাণ্ডের বাগানে চরতে গিয়েছিল। তখন তিনি তাঁর বাগানের ঘরে বসে খেয়াল গাইছিলেন। সেই গান শোনার পর থেকে গাধাটা মাঝে মাঝে ঐ রকম আঁৎকে লাফিয়ে উঠছে হুজুর। সুতরাং দোষ যদি কিছু থাকে সে আমার গাধারও নয়, আমারও নয়—সে ঐ গায়কের।

এলেন কোকিলকণ্ঠ গীতিব্রহ্মাণ্ড। তিনি সব শুনে বললেন—তা হতে পারে। গানের প্রভাব খুব জোরালো। গানে কী না হয়? বলে তিনি গানের সাহায্যে অসম্ভব ঘটনা ঘটানোর তিনটি দৃষ্টান্ত দিলেন। তারপর বললেন—গান তো আমি ভালই গাই মহারাজ। তবে পরশু দিন সকালে যখন গান গাইছিলুম তখন হঠাৎ এ রাজ্যের বিখ্যাত চোর চোট্টারাম বাটপারিয়ার কথা মনে পড়ে যায়। সে এখন চুরি ছেড়ে দিয়ে ভক্ত সেজেছে। বিচিত্র তার বেশবাস। তার পরণে কাপালিকের মতো লাল লুঙ্গি, গায়ে বৈষ্ণবের মতো নামাবলী, মুখে মুসলমান পীরের মতো লম্বা দাড়ি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতো গোঁফ চাঁচা, বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতো মাথা ন্যাড়া আর জৈনদের মতো কপালে সাদা তিলক।

একটা ধাপ্পাবাজ চোরের এইরকম মিশ্র ভক্তের ভোলের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আমার গান গুলিয়ে গিয়েছিল। খানিকক্ষণ শুধু একটা লাইনই গেয়েছি: মা ধাপ্পো রে রে গাধা। ভুল সংস্কৃতে এর মানে হতে পারে—ওরে গাধা, তুই ধাপ্পা দিস না। তা এই শুনে গাধাটা বোধ হয় ভয় টয় পেয়ে খাপ্পা হয়ে গিয়েছে। তাই ঐ রকম একটা অসুখ দেখা দিয়েছে। সুতরাং দোষ যদি কিছু থাকে সে তো চোট্টারামের।

এবারে ধরে আনা হল চোট্টারামকে। তার বেশ-বাস দেখলে সত্যিই হাসি পায়। হাসল সবাই। রাজা তার এই বিচিত্র সাজের জন্যে তাকে অপরাধী করলেন। বললেন—হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে দু বছর সশ্রম ক্যারাদণ্ড। সে বলল মহারাজ, আগে আমার কথা শুনুন। আগে আমি বিখ্যাত চোর

ছিলুম। একবার এ রাজ্যের সভাপণ্ডিতের ঘরে চুরি করতে যাই। বাড়িতে ঢুকে ঘরের দরজা খোলা দেখে ঘরের মধ্যে ঢুকে খাটের নিচে লুকিয়ে পড়ে শুয়ে থাকি। এক সময় একটা ইঁদুরের লেজ আমার নাকে ঢুকে যায়। সুড়সুড়িতে আমি হেঁচে ফেলি। পণ্ডিতমশায়ের গিন্নী খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। তিনি সেই হাঁচির শব্দে চমকে ওঠেন। তিনি এত মোটা যে ঐ চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খাট ভেঙে আমাদের ঘাড়ে পড়ে যান! ইঁদুরটা চেপ্টে পুরো মরে যায় আর আমি আধমরা হয়ে যাই। আমার পা খোঁড়া হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে আমাকে চুরি ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু সংসার তো চালাতে হবে। তাই এখন ভক্ত সেজে ভিক্ষে করি। যাতে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক আমাকে ভিক্ষে দেয় তাই ঐ রকম বেশ ধরেছি। মহারাজ, আমার অপরাধ কোথায়? পণ্ডিতমশায়ের গিন্নী অত মোটা না হলে এত সব কাণ্ড হত না। সুতরাং দোষ পণ্ডিতমশায়ের। কেন তাঁর গিন্নী অত মোটা হবেন?

মহারাজ বললেন—ঠিক। তাহলে সভাপণ্ডিতই অপরাধী। হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড।

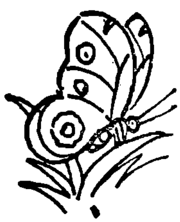
পণ্ডিতমশাই সভাতেই ছিলেন। তিনি সব শুনে বললেন—মহারাজ, আমি তো আপনারই চাকরি করি। আপনি যদি আমায় এত বেশী টাকা চাল ডাল শাক-সবজি মাছ ইত্যাদি না দিতেন তাহলে গিন্নীকে অত খাওয়াতেও পারতুম না, আর সে অত মোটাও হতে পারত না। সুতরাং আমার অপরাধ কোথায়? অপরাধ তো আপনারই।

হবুচন্দ্র সব শুনে বললেন—ঠিকই তো। তাহলে দোষ আমারই। আমারই হাজার টাকা জরিমানা। অনাদায়ে দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড।

রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী রাজকোষ থেকে হাজার টাকা এনে দিয়ে দেওয়া হল নিরপরাধ আসামী পণ্ডিত-মশাইকে। কিন্তু চোট্টারাম বলল—পণ্ডিত মশায়ের গিন্নীর জন্যে আমাকে শাস্তি পেতে হয়েছে। যদিও আমি নিরপরাধ, তবু আমাকে রাজসভায় বিচারের জন্যে ধরে আনা হয়েছে। সুতরাং পণ্ডিতমশায়ের উচিত টাকাটা আমাকে দিয়ে দেওয়া।

সবাই এটা মেনে নিল। সুতরাং পণ্ডিতমশায়ের হাত থেকে টাকাটা নিল চোট্টারাম। কিন্তু টাকাটা সেও নিয়ে যেতে পারল না। একই কারণে চোট্টারামের কাছ থেকে টাকা নিল কোকিলকণ্ঠ। তার কাছ থেকে রামু ধোপা। তার কাছ থেকে গয়লা। তার কাছ থেকে পাচক। তার কাছ থেকে টাকাটা শেষ চলে এল রাজার কাছে। কারণ একেবারে গোড়াতে কষ্ট পেতে হয়েছিল রাজাকেই। তিনিই প্রথম নিরপরাধ ব্যক্তি যাঁকে শাস্তি পেতে হয়েছে।

অতএব রাজকোষের টাকা আবার রাজকোষেই ফিরে এল। হবুচন্দ্রের রাজ্যে শান্তি নামল। হবুচন্দ্র গোঁফে মোচড় দিয়ে জয়ের হাসি হাসলেন। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল—এমন বুদ্ধিমান রাজার রাজ্যে বাস করা পরম ভাগ্যের কথা।





এনকেফ্যালাইটিস

ডাঃ স্বপনকুমার গোস্বামী

এনকেফ্যালাইটিস। কেউ লিখছে এনসেফ্যালাইটিস। কিন্তু অভিধান ও ব্যুৎপত্তিগত উচ্চারণে দুটোই ঠিক। গ্রীক শব্দ 'Egkephalos' (মস্তিষ্ক) এবং 'Itis' (প্রদাহ) মিলে 'Encephalitis' শব্দটি উদ্ভূত। অর্থাৎ যে রোগে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ ও তার ঝিল্লী-আবরণীর প্রদাহ সৃষ্টি হয়। ইদানীং এই অসুখের প্রাদুর্ভাবে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনসাধারণকে এনকেফ্যালাইটিসের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করছেন।

প্রকৃত বিচারে, মগজের গুরু মস্তিষ্কটি আক্রান্ত হলে তবে এনকেফ্যালাইটিস বলা যায়। নচেৎ ভাইরাস-আক্রান্ত অংশকে প্রাধান্য দিয়ে বলা হয়—'মেনিংগো এনকেফালাইটিস' 'এনকেফালোমাইলোইটিস', 'মেনিংগো এনকেফ্যালোমাইটিস', মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীন ফোঁড়ার (সেরিব্রাল অ্যাবসেস) কারণে এনকেফ্যালাইটিস প্রভৃতি। অবশ্য আজকের মহামারীর কারণ এক ধরনের জাপানী ভাইরাস-ঘটিত এনকেফ্যালাইটিস। 'ভাইরাস' বলতে এক ধরনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবিত অস্তিত্ব বোঝায় যা সাধারণ অণুবীক্ষণে দেখা যায় না, অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে দেখা যায়। 'ভাইরাস জীবন্ত দেহকোষে পরজীবী এবং নানা রোগ সৃষ্টিকারী। 'ভাইরাস' চরিত্র আজও কুহেলীতে ভরা, ফলে ভাইরাস-ঘটিত অসুখগুলির প্রতিষেধকও চিকিৎসাবিজ্ঞানীর অজানা।

এনকেফ্যালাইটিস রোগটি আজকে নতুন আমদানী নয়। এ রোগ প্রথম দেখা দেয় ১৮৭১ সালে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের টোকিওতে এনকেফালাইটিসে প্রায় ছয় হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়। ফলস্বরূপ চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এই ভয়াবহ রোগের উৎসসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৪ সালে প্রধানতঃ জাপানী বিজ্ঞানীদের সাধনায় ঐ এনকেফ্যালাইটিসের কারণ হিসেবে 'ভাইরাস' আবিষ্কার হয়। এছাড়া দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশ থেকে "ইয়োলো ফিভার" নামক ভয়াবহ রোগের কারণ সন্ধান ও তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে গ্রীষ্মপ্রধান ও শীতপ্রধান দেশের নানা গবেষণাগারে পরীক্ষার সময়ে প্রায় দেড়শ জাতের ভাইরাসের সন্ধান পান। এর মধ্যে একটি জাতের ভাইরাস কীটপতঙ্গ-বাহিত হয়ে মানুষের শরীরে এনকেফ্যালাইটিস-সংক্রমণ ঘটায় বলে জানা যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে এনকে-ফ্যালাইটিস মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে এবং মহামারী এলাকার নাম দিয়ে ভাইরাসটি চিহ্নিত হয়েছে। যেমন 'জাপানীজ বি এনকেফ্যালাইটিস,' 'মুরিভ্যালী এনকেফ্যালাইটিস', 'পশ্চিম নীলনদ এনকেফ্যালাই-টিস' ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাইরাসের জাতপাত বিভিন্ন গোত্রের। প্রতিটি ভাইরাসের ভেক্টর বা বাহক বিভিন্ন এবং ভাইরাসের উদ্দিষ্ট আক্রমণের লক্ষ্য-স্থল বা জীবদেহ বিভিন্ন।

এনকেফ্যালাইটিসের প্রাদুর্ভাবের আগে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ঐ ভাইরাসের ডেফিনিটিভ হোস্ট বা নির্দিষ্ট জীবজন্তু বা পশুপাখীর মধ্যে ঐ রোগের মড়ক লাগে। ঐ রোগাক্রান্ত গবাদি পশু বা পাখিকে কামড়াবার পর, রক্তপায়ী পরজীবী মশাটি মানুষকে কামড়ালে মনুষ্যদেহে ঐ এনকেফ্যালাইটিস ভাইরাস সংক্রমিত হয়। সাধারণভাবে এনকেফ্যালাই-টিস ছোঁয়াচে নয়, সব মশা থেকেই এনকেফ্যালাইটিস হয় না। বর্তমান মহামারীটির বাহক (ভেক্টর) কিউলেকস্ বিশ্নয় কমপ্লেকস। এই ভেক্টর পাঁচশ থেকে হাজার জন মানুষকে কামড়ালে একজনের ঐ রোগ হবার সম্ভাবনা। জাপানীজ বি এনকেফ্যালাইটিসে শতকরা নব্বই জনের অতি সামান্য রোগলক্ষণ দেখা

দেয়, শতকরা দশ জন ভয়ানকভাবে আক্রান্ত হয়। এই রোগে মৃত্যুহার শতকরা পঁচিশ থেকে চল্লিশ। প্রথম সপ্তাহে এনকেফ্যালাইটিসে-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু না হলে শতকরা কুড়ি জন সাধারণতঃ আরোগ্যলাভ করে। তবে এ রোগে আক্রান্ত শতকরা পঁয়ত্রিশ জনের পরবর্তী জীবনে পক্ষাঘাত, বুদ্ধিবৈকল্য, মূর্ছা প্রভৃতি দেখা দেয়। জাপানী এনকেফ্যালাইটিস জাপান থেকে কোরিয়া মালয়েশিয়া ঘুরে ভারতের দক্ষিণ দিকে প্রথম অনুপ্রবেশ করে ১৯৫৫ সালে। প্রথম দেখা দেয় নাগপুরে। পরে মাদ্রাজে এনকেফ্যালাইটিস মহামারী দেখা দেয়। ১৯৫৭-৫৯ সালে মহীশূরের এনকেফালাইটিসটি কে. এফ, ডি. (K. F, D.) নামে চিহ্নিত হয়। এই কে. এফ. ডি বাঁদর দ্বারা বাহিত হয়েছিল দক্ষিণ ভারত বিজয় সমাপ্ত করে এনকেফ্যালাইটিস উত্তর ভারতের পথে অগ্রসর হয়। আগ্রায় ১৯৫৮ সালে এই রোগ দেখা দেয়। ১৯৭৩ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় সর্বপ্রথম এনকেফ্যালাইটিস মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঐ মহামারীর ফলে দুটি জেলায় যথাক্রমে ৭৮ ও ১৭৬ জনের প্রাণহানি ঘটে। ১৯৭৬ সালে পুনরায় বর্ধমানে ঐ মহামারী দেখা দেয়। শুওর হাঁস মুরগী প্রমুখ গৃহপালিত জন্তু হতে কিউলেকস্ মশাবাহিত হয়ে এই রোগ এসেছিল। ১৯৭৮ সালে উত্তর প্রদেশের এগারটি জেলায় ২৮১৭ জন এনকেফ্যালাইটিসের কবলে পড়ে ও শতকরা পঞ্চাশ জনেরও বেশী মারা যায়। ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে এনকেফ্যালাইটিসের করাল ছায়া পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করে। শুধু কলকাতাতেই এই রোগে ২১৪ জনের মৃত্যু হয়। ১৯৭৯ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বর এই রোগ আত্মপ্রকাশ করে এ যাবৎ—২৫২টি গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে সংবাদপত্রে প্রকাশ "গত ১লা নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের চারটি জেলায় ২৫১ জন প্রাণ হারিয়েছে। এর মধ্যে বর্ধমান ১৬৭ জন হুগলী ৫৮ জন, পশ্চিমদিনাজপুর ২১, বীরভূম ৫ জন।"

রোগলক্ষণ : এনকেফ্যালাইটিস ভাইরাসের প্রধান আক্রমণস্থল মগজের কোষ ও তার আবরণী। তাই মস্তিষ্কপ্রদাহের উপসর্গগুলি প্রকটভাবে দেখা দেয়। প্রথম দিকে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাথায় প্রচন্ড যন্ত্রণা, বমি, দেহে কাঁপুনি দেখা দেয়। রোগী প্রচন্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে রোগী অস্থিরতা প্রকাশ করতে করতে ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে পড়ে। হাতপায়ের খিঁচুনী দেখা দেয়। রোগীর চেতনা লোপ পায়। এ অবস্থায় সপ্তাহখানেক কেটে যায়। আগেই বলেছি প্রথম সপ্তাহে মৃত্যু না হলে শতকরা ২০ জন রোগী. পরবর্তী জীবনে পক্ষাঘাত বা স্নায়ুঘটিত অসুখের সম্ভাবনা নিয়ে বেঁচে ওঠে।

চিকিৎসা : এনকেফ্যালাইটিসের চিকিৎসা প্রসঙ্গে ১৯৭৮ সালের ৮ই আগস্টের সংবাদপত্রের সংবাদে বলা হয়েছিল যে, বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে এনকেফালাইটিসে আক্রান্ত এক শিশুর মৃত্যু ঘটলে, জনগণ ঐ অঞ্চলের চিকিৎসকদের ওপর হামলা চালায়। হাসপাতালে হাঙ্গামা, শহরে ধর্মঘট ইত্যাদি ঘটনাও ঘটেছিল। কিন্তু যে রোগের চিকিৎসা উপলক্ষ্য করে উপরোক্ত ঘটনা ঘটেছিল সেই রোগের সঠিক ওষুধ আজ এদেশে নেই। প্রতিষেধক টিকাও নেই। উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয় মাত্র। হোমিওপ্যাথগণ অবশ্য এই রোগের ঔষধের ব্যবস্থা করেন।

প্রতিষেধক : এনকেফ্যালাইটিস রোগের বিরুদ্ধে সরকার জনসাধারণকে নিম্নোক্ত 'সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ' করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বলা হয়েছে "এই রোগটি সাধারণতঃ দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের বিশেষতঃ শুকরছানা ও গরু-বাছুরের সঙ্গে বসবাসকারী লোকদের আক্রমণ করে।" তাই এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে —"মশারী খাটিয়ে ঘুমোন, বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখুন, শুকরছানা ও গরুবাছুরকে সম্পূর্ণ পৃথক জায়গায় রাখুন. এই রোগের লক্ষণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে সরকারী স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, এই রোগে আক্রান্ত রুগীকে অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি করুন।"

প্রকৃতপক্ষে এই পঞ্চ নিয়ম পাঁচজনে মেনে চললে এনকেফ্যালাইটিসের বিদেশী প্রতিষেধকের অনিশ্চয়তার মধ্যেও কিছুটা স্বস্তি মিলবে। কিন্তু কটি কথা এ প্রসঙ্গে বলার অবকাশ রয়েছে। প্রথম কথা শুধু গরীবদেরই এই রোগ হয় তা মানতে রাজী নই। তাহলে শুধু ফুটপাত ও খাটালবাসীরাই এ রোগের শিকার হত, মধ্যবিত্তরা নয়। কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলে। 'বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার' বা পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 'প্রকৃতি পরিচয়' ছাড়া পরিচ্ছন্নতা নিয়ে মাথা ঘামানো এদেশে হয় না এবং বিষয়টি প্রাথমিকভাবেই উপেক্ষা করা হয়। বাসগৃহের চারদিকে পচা ডোবা, বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে মশা মারার ব্যবস্থা করা, মশা জন্মাতে না দেওয়া, গোয়াল ও শুকরের খোঁয়াড়ের কাছ থেকে দূরে বাস করা ইত্যাদি ক্লাশ থ্রি-ফোরের ছেলেদের পাঠ্য। অথচ এই পরিচ্ছন্ন পরিবেশই মহামারী রোধে মূল কথা। গ্রামের পঞ্চায়েতগুলিকে এই পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে নির্দেশ পাঠানো হোক। সাধারণ অশিক্ষিত গ্রামবাসীর উপর পঞ্চায়েত সদস্যরা প্রভাব খাটালেই এ বিষয়ে সুফল মিলবে। এই সঙ্গে গ্রামে ব্যাঙ ধরার ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে। ব্যাঙ বিদেশে চালান যাচ্ছে। ব্যাঙে মশা খায়। সব রোগীরই হাসপাতালে ভর্তি করার সুযোগ চাই।

খেলাধুলার আসর

দলপতি উদয়ভানু

দেবাশিস দত্ত

উদয়ভানু ব্যানার্জীকে চেনে না এমন ক্রিকেট-রসিক বর্ত্তমানে বাংলায় নেই বললেই চলে। '৭৮-'৭৯ মরশুমে বাংলার হয়ে রনজি ট্রফিতে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েই উদয় সবার নজরে চলে আসে। বস্তুতঃ মিড্‌ল্ অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবেই উদয় নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেন। এ মরশুমে উদয় বাংলার দলপতি হয়ে এক বিরাট সম্মানের অধিকারী হলেন। অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর উদয়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "বাংলার দলপতি হওয়ার পর কেমন লাগছে? একটু হেসে উদয় জানালেন, "অধিনায়ক হওয়া নিশ্চয়ই এক গর্বের ব্যাপার। বাংলার অধিনায়ক হয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ বলে মনে করছি।"

প্রাক্তন দলপতি রাজু মুখার্জীকে উদয় সম্পর্কে বলতে বলায় রাজু জানালেন, "উদয় ভীষণ ভাল ছেলে। যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। খেলার ব্যাপারে উদয় ভীষণ সিরিয়াস। ও নিশ্চয়ই আরও উন্নতি করবে।"

সি. এ বি. সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্ত জানালেন, "রাজু মুখার্জীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারের খোঁজেই উদয় দলনায়ক হিসেবে মনোনীত হয়েছে। উদয় ভালো ফর্মে আছে। এবারের প্রথম দুই রনজি ম্যাচে (বিহার ও উড়িষ্যার বিরুদ্ধে) উদয় ভালো অধিনায়কত্ব করেছেন।"

উদয় সম্পর্কে দু'জন নামকরা লোকের মন্তব্য শুনে নিশ্চয়ই ধারণা করা যায় উদয় একজন দক্ষ ব্যাটসম্যান। '৭১'-৭২ মরশুমে প্রথম ডিভিশনে ক্রিকেট খেলা শুরু করেন, রনজি ট্রফিতে '৭৮-'৭৯ মরশুমে ডিব্রুগড়ে অনুষ্ঠিত আসামের বিরুদ্ধে সর্ব-প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। রনজি ট্রফিতে এ যাবৎ মোট রান করেছেন ৫৫০ এর কাছাকাছি। সর্বোচ্চ ৭৫ রান করেন '৭৮-'৭৯ মরশুমে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে।

এবারে উদয়ের ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলি। উদয়ের জন্ম ৬ মে ১৯৫৫, বাবা শ্রী মোহিনীরঞ্জন ব্যানার্জী ছেলেকে বরাবরই খেলাধুলায় উৎসাহ দিতেন। ছোটবেলায় ফুটবলে পটু হলেও একটু বড় হয়ে ব্যাট-বলকেই ভালবেসে ফেলেছিলেন। "হঠাৎ ফুটবল ছাড়লেন কেন?"—এ প্রশ্নের উত্তরে উদয় জানালেন, "বাড়ীর সামনেই নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটের মাঠ। সেখানে নিয়মিত ক্রিকেট প্র্যাকটিস হয়। অন্যান্যদের মতো আমিও ওখানে যাওয়ায় ধীরে ধীরে ক্রিকেটের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম।"

—"এ পর্যন্ত কোন্ কোন্ ক্লাবে খেলেছেন?"

—"৬৮-৬৯ এবং ৭০ নেতাজী সুভাষের পক্ষে খেলার পর '৭২ সাল পর্যন্ত এ্যালবার্টের হয়ে খেলি। '৭৩-'৭৪ '৭৪-'৭৫' এবং '৭৫-'৭৬ স্পোর্টিং ইউনিয়নের হয়ে খেলি। '৭৭-'৭৮ কালীঘাট এবং '৭৯ মরশুমে এরিয়ানে খেলেছি।"

ক্রিকেট নিয়ে মত্ত থাকলেও উদয় পড়াশুনা চালিয়ে

যাচ্ছেন। উদয় কমার্সের ছাত্র। বর্ত্তমানে স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মী। তালতলায় জন্ম হলেও এখন কাইজার স্ট্রীটের বাসিন্দা। খেলা ছাড়া অবসর সময়ে গল্পের বই পড়ে ও সিনেমা দেখে কাটান।

গতবছর দলীপ ট্রফিতে ১৬৫ রান (অপরাজিত) করে উদয় পূর্বাঞ্চল দলে নিজের জায়গা পাকা করে নেন। সেবার দক্ষিণাঞ্চলের প্রথম ইনিংসের বিরাট স্কোরের বিপক্ষে পূর্বাঞ্চল ব্যাট করতে নাবার আগে অতি বড় সমর্থকও ভাবতে পারে নি যে পূর্বাঞ্চল দল একটা পাল্টা প্রতিরোধ পড়তে সক্ষম হবে। ৭ উইকেটে ৫৩৯ রান তোলার পর দক্ষিণাঞ্চলের দলপতি ভেঙ্কটরাঘবন ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার পর পূর্বাঞ্চল যে ৪০৫ রানের ইনিংস খেলেছিল তার মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন বাংলার উদয়ভানু ব্যানার্জী। একজন নবাগত ব্যাটস্‌ম্যান হয়ে সে ম্যাচে উদয়ভানু ভেংকট, চন্দ্র, নরসীমার বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে ব্যাট করে ১৬৫ রান করেও অপরাজিত থেকে গিয়েছিলেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ দুই স্পিনার এবং নরসীমার বলকে বিনা দ্বিধায় উদয় বাউন্ডারীতে পাঠিয়েছেন। তাঁর ১৬৫ রানের মধ্যে ছিল ২১টা দর্শনীয় চার। ভাবতে অবাক লাগে ভারতের প্রথম সারির বোলাররা দেড় দিনেও উদয়কে ক্রিজ থেকে সরাতে পারেন নি। পূর্বাঞ্চলের দলপতি রাজু মুখার্জী এ খেলার পর বলেছিলেন "উদয়ের এই ইনিংস তুলনাহীন।

অধিনায়ক হবার পর এ বছর বিহারের বিপক্ষে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে বাংলা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। দলপতি উদয় নিজ আস্থায় অবিচল থেকে ইডেনের দর্শকদের এক মূল্যবান ইনিংস উপহার দেন।

উদয়ের সাথে কথা বলে উঠে আসার সময় শেষ প্রশ্ন ছুঁড়েছিলাম, "ক্রিকেটে বাংলার সাফল্যের জন্য আপনার মতামত কি?"

উদয় বললেন, "গোটা মরশুম যদি বাংলার ছেলেরা প্র্যাকটিস করার সুযোগ পায়, তাহলে বাংলা খুব তাড়াতাড়ি সাফল্যের মুখ দেখতে পাবে।"

যখন থেকে জন্ম নিল : তিন ষ্ট্যাম্প দুই বেল

শ্রীগোপাল ভৌমিক (শ্রীকান্ত)

উইকেটের ইতিহাস খুব মজার। প্রথমে তিন ষ্ট্যাম্প-এর উইকেট ছিল না। দু'খানা ষ্ট্যাম্প-এর মাথায় একখানা বেল থাকত। মাঝখানটায় মস্ত চওড়া ফাঁকা। ১৭৭৫ সালে আর্টিলারী মাঠে হ্যাম্বলডন ক্লাব আর কেণ্টের ম্যাচ খেলা হচ্ছিল। হ্যাম্বলডন ক্লাবের শেষ খেলোয়াড় স্মল যখন ব্যাট করতে এল তখন তারা চৌদ্দ রানে পিছিয়ে। কেণ্ট দলের বল দিচ্ছিল ল্যাম্পি নামে এক ফাস্ট বোলার। সে এমন সোজা আর মারাত্মক বল দিতে লাগল যে তা তিন তিন বার দুই ষ্ট্যাম্পের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে গলে গেল। কিন্তু বেল বা ষ্ট্যাম্প না পড়ে যাওয়া পর্যন্ত তো ব্যাটস্‌ম্যান আউট নয়। কাজেই স্মল মনের আনন্দে আড়াইঘন্টা উইকেটে টিকে থেকে চৌদ্দ রান করে হ্যাম্বলডন ক্লাবকে জিতিয়ে দিল।

তখন ক্রিকেটের কর্তারা স্বীকার করলেন, মাঝখানটায় আর একটা ষ্ট্যাম্প থাকা উচিত। যে বলগুলি সবচেয়ে সোজা সেগুলিই যদি কোন কাজে না লাগে তবে বোলার বেচারীর পক্ষে বড়ই দুঃখের বিষয়। সুতরাং তিন ষ্ট্যাম্প আর দুই বেল নিয়ে উইকেট চলতি হলো ১৭৭৭ সালে।



নির্মল বিশ্বাস

পর পর তিনটে উইকেট পড়ে গেছে নবারুণ সঙ্ঘের। এমনকি ভোম্বল ঘোষাল পর্যন্ত আউট। প্রতিদ্বন্দ্বী জুবিলি স্পোর্টিং-এর ফাস্ট বোলার চঞ্চল সরকার একাই ঐ তিনটে উইকেট নিয়েছে। বলও করছে বটে, যেন আগুন ছোটাচ্ছে। জুবিলি স্পোর্টিং গতবারের চ্যাম্পিয়ান, এবারে নবারুণের মুখোমুখি হয়েছে সেমিফাইনালে।

স্কোর বোর্ডে তিন উইকেটে ১০। অবস্থা খুবই শোচনীয়। কেন যে ভোম্বলদা ব্যাট নিলেন। টসে জিতে আগের রাতের বৃষ্টিভেজা পিচে চঞ্চলের বলের সামনে দাঁড়ানো দস্তুর মতো কঠিন। বকুদা আর ভোম্বলদা প্যাড্ পরে যখন মাঠে নামছে তখনই চন্দন বুঝে নিয়েছে আজকের অবস্থা কি হবে। প্রথম বলেই বকুদা ক্যাচ তুলেছিল, কিন্তু শ্লিপে দাঁড়ানো বাদলের হাত ফসকে যায়। জুবিলি স্পোর্টিং-এর সমর্থকেরা হায় হায় করে উঠেছিল। কিন্তু পরের ওভারেই বকুদাকে ফিরতে হয়েছে তিন রান করে। চঞ্চল সরকারের দ্রুত-ছোটা একটা অফ-স্ট্যাম্পের বাইরের বল মারতে গিয়ে। ব্যাটের কানায় লেগে বল সোজা একেবারে থার্ডশ্লিপের মণীশের শক্ত মুঠোয়। এর পরেই ঝন্টু ফিরে এল খালি হাতে। ঐ চঞ্চলের বলেই বোল্ড হ'ল। বলটা বুঝতে পারে নি বাঁ-হাতি ব্যাটস্‌ম্যান ঝন্টু। ইয়র্ক করে ব্যাট আর প্যাডের মধ্যে দিয়ে গলে গিয়ে অফস্ট্যাম্প ছিট্‌কে দিল। দলের রান তখন মাত্র পাঁচ, দু'উইকেট খুইয়ে। আর মাত্র পাঁচ রান যোগের পরেই দলের আশা-ভরসা এবং নবারুণ সঙ্ঘের ক্যাপ্টেন ভোম্বল ঘোষালের পতন। ওর সংগ্রহে মাত্র পাঁচ। এর আগের ম্যাচে ভোম্বলদাই একশো পাঁচ করে শক্ত খুঁটি প্রগতি স্পোর্টিংকে হারিয়েছিল। ঐ একই দোষে মরেছেন ভোম্বলদা, সেই অফ্‌স্ট্যাম্পের বাইরের বল তেড়ে মারতে গিয়ে। দলের কোচ্ কেষ্ট চক্রবর্তী বার বার ভোম্বলদাকে এ সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

প্যাড্ পরে চন্দন বসে আছে। শম্ভু সোম মাঠে

নেমে পড়েছে। আম্পায়ারের থেকে গার্ড নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায় শম্ভু—দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্যাটস্‌ম্যান। জুবিলি স্পোর্টিং-এর ক্যাপ্টেন সুজয় মুখার্জী ফিল্ডারদের একেবারে ব্যাটসম্যানের কাছে নিয়ে এসেছে। একজন তো শম্ভুর প্রায় একহাতের মধ্যে। বেঁটেখাটো শম্ভু এবারে ভালই খেলছে। গত ম্যাচে আঙ্গুলে চোট থাকায় খেলতে পারে নি।

বল করছে চঞ্চল। ওভারের পঞ্চম বল। চোখ বন্ধ করে আছে চন্দন। 'হাউজ্যাট' বলে একটা চীৎকার উঠল—ফিল্ডারদের থেকে। সর্বনাশ করেছে, এবার চন্দনের নামার পালা। আর এ ম্যাচের ওপরেই চন্দনের চাকরি পাওয়া নির্ভর করছে। ক্লাবের সম্পাদক দুলালদা ম্যাচ শুরু হবার আগে ওয়ার্নিং দিয়েছেন—'চন্দন, এই তোর লাস্ট চান্স।' সত্যিই এই মরশুমটা চন্দনের খুব খারাপ যাচ্ছে। দুলালদাকে দোষ দিয়ে কি লাভ ? এর আগের ম্যাচগুলিতে মোটেই সুবিধে করতে পারে নি, না ব্যাটে না বলে। এ বছরে ওর সবচেয়ে বেশী সংগ্রহ কুড়ি রান, তাও মিলনীর মতো ছোট দলের বিরুদ্ধে। তাছাড়া কোন ম্যাচে এক, কোনটায় পাঁচ এই সব। আর বলে তো আরও করুণ অবস্থা। কোন ম্যাচেই একটার বেশী উইকেট পায় নি। উল্টে ওর বলে বিপক্ষদলের রান হয়েছে প্রচুর। পাঁচ ওভার বল দেবার পর প্রায় সব ম্যাচেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওকে। অবশ্য ফিল্ডিংটা এখনও নষ্ট হয় নি। দুটো বেশ শক্ত ক্যাচ ধরেছে আর গেল ম্যাচে বাউন্ডারির ধার থেকে বল ছুঁড়ে একজনকে আউট করেছে।

তিন বছর বেকার বসে আছে চন্দন। চাকরির চেষ্টা করে আর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে কার্ড রিনিউ করে করে চাকরির আশা ত্যাগ করতে হয়েছে। দুটো ট্যুইশন করে কোন রকমে হাতখরচা চলে। তা' ছাড়া সবই বাবার হোটেলে। তিন বছর ধরে নবারুণের নিয়মিত ক্রিকেট খেলোয়াড়। চাকরি পাওয়ার শেষ ধাপ হিসেবে এটাকেই আঁকড়ে আছে চন্দন। তা না হলে কবে ছেড়ে ছুড়ে দিত খেলা। গরীবদের এই খেলা সয় না। কিন্তু ঐ চাকরি পাওয়ার আশ্বাসেই টিঁকে আছে। কিন্তু এবারের ফর্ম দেখে দুলালদাও বোধ হয় কিছু করার আশা ছেড়েছেন। এই ম্যাচে চন্দনের খেলার ওপরেই নির্ভর করছে ওর চাকরি—জীবনমরণ সমস্যা।

খেলা শুরু হবার আগে দুলালদা আরও বলেছিলেন, —'ক্লাবের সবাই তোকে এই খেলায় খেলাতে রাজী হয় নি, আমিই তোর হয়ে ওকালতি করেছি। এখন আমার মুখ রাখিস, আর যদি এবারও ফেল করিস তবে চাকরি তো দূরের কথা, নবারুণের হয়ে এই তোর শেষ খেলা।'

চন্দনের এই চিন্তার মধ্যে কিন্তু খেলা এগিয়েছে। শম্ভু সোমের বিরুদ্ধে প্রথম বলেই যে 'কট বিহাইন্ড'-এর আবেদন উঠেছিল তা নাকচ হয়ে গেছে। প্রথমে একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিল শম্ভু। কিন্তু ক্রমেই নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেয়েছে। এর মধ্যেই গোটাকয় চমৎকার মার বেরিয়েছে ওর হাত থেকে। দু'টো কভার ড্রাইভ তো দেখার মতো। ব্যাটে বলে হওয়া মাত্র বল মাঠের বাইরে। উইকেট আর পড়ে নি। রান উঠেছে ৪০। ওদিকের ব্যাটসম্যান সঞ্জয় ব্যানার্জী এখনও হাত খুলছে না। ঠুকঠাক করে চলেছে। সঞ্জয় বেশ ঠান্ডা মাথায় বুঝে শুনে খেলে। চার নম্বর ব্যাটসম্যান সঞ্জয়ের রান এখন একের কোঠায়। জুবিলি স্পোর্টিং-এর ফাস্ট বোলাররাই এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। তবে চঞ্চলের বলের ধার যেন কমেছে।

স্কোরবোর্ডে রান উঠেছে তিন উইকেটে ৬০। বোলার পাল্টেছে। ফাস্ট বোলারদের জায়গায় এসেছে স্পিনার সুব্রত ও শর্মা। বাঁহাতি স্পিনার সুব্রত মাঝে মধ্যে মারাত্মক হয়ে ওঠে, তবে শর্মার বলের ধার একটু বেশী। ওর বল বেশ পাক নেয় আর ফ্লাইটও ভাল। কিন্তু ঐ ৬০-এর মাথায় এসেই বিপদ ঘটল। সঞ্জয় ব্যানার্জী শর্মার একটা ওয়েল ফ্লাইটেড বল ক্রীজ ছেড়ে মারতে এসে ফসকে গেল। ব্যস! ঘুরে দেখার আগেই ওদের উইকেটকীপার স্ট্যাম্প ভেঙে দিয়েছে। নবারুণের চার উইকেটে ৬০।

চন্দন এতক্ষণে ঘামতে শুরু করেছে, পেটটা যেন কি রকম গুলোচ্ছে। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। উপায় নেই, ব্যাট হাতে নেমে পড়ল চন্দন। দুলালদার সেই কথাগুলো মনে উঁকি দিয়ে গেল। মাঝ মাঠে শম্ভু এসে বলল, 'চন্দন, সাবধানে খেলিস। শর্মার বল কিন্তু বেশ ঘুরছে, লাঞ্চ অব্দি ঠুক্‌ঠুক্‌ করে চালিয়ে যা।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই গার্ড নিয়ে উইকেটের সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল চন্দন। জুবিলি স্পোর্টিং-এর সব ক'জন

ফিল্ডার যেন পিষে মারবে ওকে। এক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওদের দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান পুলক, বল করছে শর্মা। প্রথম বলটা অফস্টাম্পের বেশ বাইরে দিয়ে চলে গেল। চন্দন মারবার কোন চেষ্টাই করে নি। পরের বল দেবার আগে জুবিলি স্পোর্টিং-এর ক্যাপ্টেন ছুটে এসে শর্মাকে কানে কানে কি যেন বলে গেল। এই বলটা গুড লেংথ ছিল, পা বাড়িয়ে খেলল চন্দন। ওভারের শেষ বলটা চন্দনের সামনে এগোনো পায়ে এসে লাগল। এল.বির আবেদন উঠেছিল। আম্পায়ার নাকচ করে দিলেন। ওভার শেষ! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। লাঞ্চের আগে আরও দু'ওভার বল হয়েছে। শম্ভুর দুটো রান নিয়ে লাঞ্চের সময় দলের রান গিয়ে উঠল চার উইকেটে ৬২। চন্দনের সংগ্রহে শূন্য।

লাঞ্চের পর খেলার চেহারা পাল্টে গেল। শম্ভু বেশ হাত খুলে মারতে লাগল। ওদিকে চন্দনও কি-রকম নিজের ওপর আস্থা ফিরে পাচ্ছে। সুব্রতর বলে পরপর দুটো চার মারল—একটা মিড্অনের মধ্যে দিয়ে, আরেকটা স্কোয়ারকাট করে। শম্ভুও শর্মার বলে একটা প্রচণ্ড হুক করল, আরেকটা সুব্রতর বলে স্ট্রেট ড্রাইভ। হাত প্রায় জমে উঠেছে। নবারুণের রান সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল—৮৫।

দু'দিনের খেলা। প্রথম ইনিংসে রান ভাল তুলতে না পারলে সমূহ বিপদ। ড্রিংকস্-এর সময় হ'ল! টুয়েলফ্থ্ ম্যান সমীর বলল, 'চন্দন পিটিয়ে খেল্। শম্ভুদা আরেকটু জোরে চালান।'

চন্দন কিছু বলল না। বলল শম্ভুই।—এর থেকে আর কি জোরে চালাব? ঠিক আছে দেখা যাক—।

খেলা আবার শুরু হ'ল। সেই চঞ্চল এসেছে বল করতে। চন্দনই ফেস করছে। প্রথম বলটা বাম্পার, কোনরকমে সরে গিয়ে মাথা বাঁচাল চন্দন। পরের বলটাও বাম্পার। এবারেও সরে মাথা বাঁচাল। তৃতীয় বলটা তো দেখতেই পেল না। চঞ্চল যেন ক্ষেপে গেছে। চতুর্থ বলটাও কোনরকমে ঠেকালো চন্দন। পঞ্চম বলটাকে মিড উইকেটে ঠেলে দিয়েই ১। এবার শম্ভুর পালা। গার্ড নিয়ে দাঁড়িয়েছে শম্ভু। আবার বাম্পার। 'উফ্স!' বলে বসে পড়ল শম্ভু সোম। বলটা সপাটে মুখে এসে লেগেছে। উঃ, কি রক্ত! সবাই ধরাধরি করে মাঠে নিয়ে গেল শম্ভুকে। খেলা কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ। দারুণ লেগেছে। ও বোধহয় আর এ ম্যাচে খেলতে পারবে না। বিপদের ওপর বিপদ। প্রাথমিক বিপর্যয় যখন নবারুণ প্রায় কাটিয়ে উঠছে, ঠিক সেই সময় শম্ভুর এই আঘাত।

নতুন ব্যাটসম্যান খোকন সেন মাঠে নামল। দলের রানসংখ্যা এখনও ১২৫ পেরোয় নি। খোকন নবারুণের উইকেটকীপার। মাঝে মধ্যে ভাল ব্যাট করে। তবে ভরসা করা যায় না। এরপরে নবারুণ আর সুবিধে করতে পারেনি, মোট ১৬০ রান করে সকলে আউট। শম্ভু আর মাঠে নামতে পারে নি। চন্দন ৩৫ রান করে আউট। বাজে বলেই আউট হয়েছে ও। ভাগ্যটাই খারাপ। শম্ভুর ঐ অ্যাকসিডেণ্টের পর নিজের ওপর আস্থা ফিরে পায় নি। জুবিলি স্পোর্টিং-এর অন্য ফাস্ট বোলার তুষারের একটা ফুলটস ড্রাইভ করতে গিয়ে সোজা ক্যাচ তুলে প্যাভেলিয়ানে ফিরে গেছে। ফেরার পর দুলালদার দিকে আর চোখ তুলে তাকাতে পারে নি চন্দন।

এবার জুবিলি স্পোর্টিং-এর ব্যাটিং। ওদের পরপর পাঁচজন খুব ভাল ব্যাট করে। তার মধ্যে তিননম্বর বিজন পাল আর চার নম্বর ভোলা দত্ত মারাত্মক। পিছনে বেশ কয়েকটা সেঞ্চুরী করেছে ওরা দু'জনে প্রথম থেকেই টাইট ফিল্ডিং দিতে লাগল নবারুণ। শম্ভুর বদলে সমীর নেমেছে। জুবিলি স্পোর্টিং-এর ওপেনিং জুটি বেশ ভাল খেলছে। পুলক তো এর মধ্যেই দুটো চার মেরেছে নিমাইয়ের বলে। ওদের রান সংখ্যা এখন বিনা উইকেটে ১৫। হঠাৎ পুলক নিমাইয়ের একটা সোজা বল মিস্ করে বোল্ড। পরের ওভারেই তিননম্বর ব্যাটসম্যান বিজন ফিরে গেল চন্দনের বলে। ইতিমধ্যে ফাস্ট বোলার গোবিন্দর জায়গায় চন্দন এসেছে। জুবিলি স্পোর্টিং-এর রান এখন দুই উইকেটে ২০।

পরপর দুটো মেডেন পেল নিমাই। অন্য প্রান্তে চন্দনের এক ওভারে পাঁচ রান হ'ল। ওদের সজল চন্দনের একটা আলতো বলে চমৎকার স্কোয়ার কাট করে ৪ করল। কিন্তু নিমাইয়ের পরের ওভারেই পরপর দুজন ফিরে গেল। সজল আর চার নম্বর ব্যাটসম্যান ভোলা দত্ত। সজল সেকেণ্ড শ্লিপে একটা

শক্ত ক্যাচ দিয়েছিল। সমীর মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্যাচটা ধরে ফেলে। অবস্থা ক্রমশই জুবিলি স্পোর্টিং-এর প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে। চার উইকেটে ২৫। নবারুণ দলের সবাই যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। একটা বলও গলাতে পারছে না জুবিলি স্পোর্টিং-এর ব্যাটসম্যানেরা। ছ নম্বর ব্যাটসম্যান শঙ্কর প্রায় কাঁপতে কাঁপতে ক্রীজে এল। বোঝাই যাচ্ছে ওদের ড্রেসিং রুমে দস্তুরমতো থরহরি কম্প শুরু হয়ে গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জুবিলি স্পোর্টিং-এর প্রথম ইনিংস গুটিয়ে গেল। স্কোর বোর্ডে তখন মোট রান ৫৬। চন্দনরা বিশ্বাস করতে পারছে না সংখ্যাটা।

খেলা ভাঙতে তখনও আধঘণ্টা বাকি। নবারুণের কাছে যা অভাবিত তাই হয়েছে। জুবিলি স্পোর্টিংকে 'ফলো-অন' করানো হয়েছে। দ্বিতীয় দফার শুরুতেই জুবিলি স্পোর্টিং অফেন্সিভ খেলা আরম্ভ করল। খুব সম্ভব নিজেদের স্নায়ুকে চাবকে তুলতে। খেলা শেষে জুবলি স্পোর্টিং-এর রান উঠল বিনা উইকেটে ৪০।......পরের দিন।

খেলাা শুরু হতে দেরী আছে কিছু। চন্দন ড্রেসিং রুমে গেছে। দুলালদার সঙ্গে এর মধ্যে আর দেখা হয় নি। হঠাৎ দুলালদার কতকগুলো কথা কানে যেতে থমকে গেল চন্দন। দুলালদা বলছেন—'লজ্জা করে না তোর বকু ? বুড়োধাড়ি হয়েছিস, দু' দুটো ইনিংসে দশ-এর কোঠাও পেরোতে পারিস নি। তোকে দেবো চাকুরি ? চেয়ে দেখ ঐ চন্দন সেনকে। বল করতে পারে, ব্যাট করতে পারে আর তুই ? না পারিস ব্যাট ধরতে না বল করতে। আর ফিল্ডিং-এর কথা তো ছেড়েই দিলাম। পায়ের তলা দিয়ে দু দুটো চার দিলি ওদের—।' কী যেন বলতে গেলেন বকুদা। কিন্তু দুলালদার কথার তোড়ে থেমে গেলেন।—'চুপ, তুই আর চাকরির কথা বলতে আসিস না। এই ম্যাচের পর চন্দনের নাম আমি প্রোপোজ করব আমাদের অফিসের ম্যানেজারের কাজে, এই বলে রাখছি।' মনটা ধ্বক করে উঠল চন্দনের। তাহলে বকুদাও তার মতো চাকরি পাবার আশায় এখানে পড়ে আছেন ? কিন্তু বকুদার তো বয়েস প্রায় তিরিশ এখনও উনি চাকরি পান নি ? বকুদার এই অবস্থার কথা তো কোনদিন জানত না। ভাবতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল চন্দন ; হঠাৎ নিমাই এসে ওর কাঁধে হাত রাখতে সম্বিত ফিরে এল।—'আরে কি শুনেছিস, দুলালদার চাকরি পাইয়ে দেবার কথা ? বকুকে চাকরি দেবে, না কলা দেবে। যা খেলছে তাতে আর চাকরি পেতে হয় না।' চন্দন আচমকা নিমাইকে জিজ্ঞেস করে,—'আচ্ছা বকুদা এখনও চাকরি পান নি কেন ?' যেন নতুন কথা শুনল নিমাই। বলল, 'আরে চাকরি পাওয়া কি মুখের কথা ? কত কাঠখড় পোড়াতে হয়। এই বকু মজুমদারকে তো অনেকদিন ধরেই জানি। থাকে মাণিকতলায় একটা ভাড়া বাড়িতে। ওরা পাঁচ ভাই, দু'বোন। বকুই বড়। ওদের বাবা মাষ্টারী করে। তিন ভাই স্কুলে পড়ে। এক ভাই কলেজে। বি. এ. পাশ বকু চাকরি চাকরি করে পাগল হয়ে গেছে। নিমাইয়ের গলায় সমব্যথীর সুর। ও আরও বলে, 'যে প্যাণ্ট আর জামাটা বকু পরে আছে সেগুলো আমিই দিয়েছি। সত্যি ওর দুঃখ দেখলে কষ্ট হয়। ক্রিকেট খেলাটা ওর শুধু খেলার জন্যে খেলা নয় মরা বাঁচার সমস্যা। শুনেছি দুলালদা বলেছেন, এই ম্যাচে ভাল খেলা দেখাতে পারলে একটা চাকরি হয়তো ওকে জুটিয়ে দেবেন। কিন্তু প্রথম ইনিংসে এত খারাপ লেগেছে যে বকুর শেষ আশাটুকুও হয়তো ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। বোধহয় বকু তাই দুলালদার কাছে গিয়েছে কিছু বলতে।' এত কথা শুনার পর চন্দন নিজের অবস্থা চিন্তা করে। নিমাই হয়তো জানে না বকুদা আর ওর মধ্যে অজান্তে একটা প্রতিযোগিতা চলেছে। দুলালদার আশা-দেওয়া চাকরি কে পাবে কে জানে ?.........

খেলার সময় এসে গেল। নবারুণের ফিল্ডাররা মাঠে নেমে পড়েছে। ওদিকে জুবিলি স্পোর্টিং-এর ওপেনিং জুটিও প্যাভেলিয়ান থেকে বেরিয়ে পড়েছে। গার্ড নিয়ে দাঁড়াল পুলক। নিমাই-ই বল শুরু করল। আজ মাঠে নেমে চন্দন শুধু বকুদাকে দেখছে। কখনো কষ্ট হচ্ছিল ওর অবস্থা ভেবে। আবার কখনো নিজেকে বকুদার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছিল। ভাগ্যিস বকুদা খারাপ খেলছেন এই ম্যাচে। একস্ট্রা কভারে ফিল্ড করছেন বকুদা আর চন্দন থার্ড শ্লিপে।

আজ বড় ভাল খেলছে পুলক। প্রত্যেকটা বল দেখে শুনে হিট করছে। নিমাই আর গোবিন্দর বলে

এর মধ্যেই তিনটে চার মেরেছে। একটু আগে একস্ট্রা কভারের মধ্যে দিয়ে একটা চার মেরেছে অন্য প্রান্তের ব্যাটসম্যান। বকুদা ধরতে পারেনি।

দশ ওভার বলের পর চন্দনের ডাক পড়ল। জুবিলি স্পোর্টিং-এর রান বিনা উইকেটে ৮০। চন্দনের প্রথম বলেই চার মারল পুলক। দ্বিতীয় বলেও চার। বকুদা কি হাসছে চন্দনের বলে এই রকম পেটাতে দেখে? উনি কি জেনে গেছেন চন্দন ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বী? তৃতীয় বলটা কিন্তু বাজেভাবে মারল পুলক, উঁচু হয়ে গোবিন্দর মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে—চার! কিন্তু তারপরের বলেই আউট। চন্দনের মাপা লেংথের বলটাকে স্ট্রেট ড্রাইভ করতে গিয়ে কট অ্যান্ড বোল্ড। জুবিলি স্পোর্টিং-এর এক উইকেটে ৯০। অবস্থা নিশ্চয় ভাল। ইনিংস পরাজয় এড়াতে হ'লে আর মাত্র চোদ্দ রান দরকার। পরের ওভারে কিন্তু ওদের বিজন আর অন্য ওপেনিং ব্যাটসম্যান সজল আউট হয়ে গেল। দুটো উইকেটই পেয়েছে অপর স্পিনার পরেশ। বিজন খুব সম্ভব আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। ও এল্-বি হয়ে ফিরেছে জুবিলি স্পোর্টিং-এর রান তিন উইকেটে ৯৫। অবস্থা এখন একটু খারাপের দিকে নিশ্চয়। চতুর্থ উইকেটের জুটি কিন্তু বেশ জমে গেল।

চন্দনকে আর বল করতে দেওয়া হচ্ছে না। অপর দিকে পরেশকেও সরানো হয়েছে। নিমাই আর গোবিন্দ আবার এসেছে। জুবিলি স্পোর্টিং-এর রান এখন তিন উইকেটে ১৫২। এর পরেই লাঞ্চ। লাঞ্চের পরে কিন্তু জুবিলি স্পোর্টিং আবার বিপদে পড়ল। পরপর দুটো উইকেট গেল, একটা কট্ গোবিন্দর বলে আর অন্যটি রান আউট। ক্যাচটা অবশ্য বকুদাই ধরেছিলেন। ক্যাচটা যখন বকুদা ধরতে যাচ্ছিলেন তখন চন্দনের একবার ইচ্ছে হয়েছিল বকুদাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ও নিজেই ক্যাচটা ধরে। বকুদা আর চন্দন বেশ কাছাকাছিই ফিল্ডিং করছিল তখন।

চা-পানের মিনিট পঁয়তাল্লিশ আগেই জুবিলি স্পোর্টিং-এর বাদ বাকী উইকেটগুলো পড়ে গেল। মোট রান ২২০। অর্থাৎ ১১৭ রান করলেই নবারুণের সরাসরি জয়। বকুদা আর ক্যাপ্টেন ভোম্বল ঘোষালকে দিয়ে নবারুণ ব্যাট শুরু করল। প্রথম বলেই বকুদা একটা খোঁচা দিয়েছিলেন। ভাগ্যের কথা ব্যাটের কানায় লেগে বলটা শ্লিপের মাথার ওপর দিয়ে সোজা বাউন্ডারিতে চলে গেছে। 'এই বকুটাই আমাদের ডোবাবে।' চিৎকার করে উঠলেন দুলালদা। 'কি হচ্ছে বকু?' যেন বকুদাকে ধমকাচ্ছেন। এর পরের তিনটে বল বকুদা বেশ আস্থার সঙ্গে খেললেন, কিন্তু পরের বলেই আবার সেই বাইরের বল খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা। তবে এবারে ব্যাট আর বল ছুঁতে পারে নি।

খেলা চলল। সেমি ফাইনালে 'আউট রাইট' জয়ের আলাদা দান যদিও, প্রথম ইনিংসের লীড্-এর জন্যে ফাইনালে উঠতে অসুবিধে হবে না। তাই নবারুণের ব্যাটস্ম্যানেরা পিটিয়ে রান তুলতে লাগল আর তার ফলেই তিনটে উইকেট মাত্র ৪০ রানে পড়ে গেল চা-পানের আগে। বকুদা নট-আউট ২০। ভালই খেলছেন। চোটের জন্যে শম্ভু সোম খেলতে পারছে না। তাই চন্দনকে নামতে হল পাঁচ নম্বর ব্যাটস্ম্যান হিসেবে। রান মোটামুটি এগোচ্ছে, তিন উইকেটে ৭০। বকুদা ৩০-এর কোঠায় আর চন্দনের ১৫। বকুদা ফেস করছেন শর্মাকে। প্রথম বলটা সজোরে সুইপ করলেন—চার বকুদার এই ফর্মে ফিরে আসায় চন্দনের ভীষণ হিংসে হচ্ছে। কারণ ওর খারাপ খেলার ওপর চন্দনের চাকরি পাওয়া নির্ভর করছে। উঃ! শর্মা আর সুব্রত কি করছে? আউট করতে পারছে না বকুদাকে? আর ওদিকে বকুদাও যেন কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছে। শর্মার আরেকটা বলও মাঠের বাইরে পাঠাল ব্যাক ফুটে ড্রাইভ করে। বকুদার হাতে মার আছে। হাত জমে যাওয়ায় ওর ফুটওয়ার্ক আর টাইমিং জ্ঞানের দক্ষতা প্রকাশ পাচ্ছে। নবারুণের রান এখন ১০২ তিন উইকেটে। হঠাৎ বকুদা সুব্রতর একটা বল মিড্ উইকেটে ঠেলে রিস্কি সিঙ্গলের জন্যে চন্দনকে ডাক দিয়েই ক্রীজ ছেড়ে মাঝ-মাঠে চলে এসেছেন। চন্দনের তখন আর অপর প্রান্তে যাবার সময় নেই। নির্ঘাত বকুদা রান আউট হবেন। মাঝমাঠে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। 'এই সুযোগ, বকুদাকে আউট করে দেবার'—চন্দনের মনের ভেতর কে যেন বলে উঠল। চাকরির প্রতিদ্বন্দ্বী এখন ওর হাতের মুঠোয়। চন্দন জানে, ও যদি নিজের ক্রিজ থেকে না বেরোয় তবে বকুদা আউট হয়ে যাবেন। আর এই আউটের জন্যে কেউ চন্দনকে দোষ দিতে পারবে

না। হঠাৎ নিমাইয়ের কথাগুলো মনে পড়ল তার।··· 'বড় কষ্টে আছে রে বকুরা। একটা চাকরির জন্যে পাগলের মতো চেষ্টা করে চলেছে। দুলালদা বলেছেন —এই ম্যাচেই ওর লাস্ট চান্স।

কথাগুলো ভাবতে যত সময় গেছে তার অনেক আগেই ক্রিজ ছেড়ে মাঠের মধ্যে চলে এসেছে চন্দন। সেখানে বকুদা হতাশ ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। 'হাউজ্যাট' কথাটা শোনার আগেই চন্দন প্যাভিলিয়নে ফিরে চলল, স্কোর বোর্ডে তখন নবারুণের চার উইকেটে ১০২। বকু মজুমদার নট আউট—৫৬। চন্দন সেন রান আউট —২০।

খেলাধুলোর প্রশ্ন ও উত্তর

শচীন শঙ্কর

খেলাধুলো সম্পর্কে তোমাদের নানান প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই তো এই বিভাগটা শুরু হল। তবে একটা কথা, প্রশ্ন যখন পাঠাবে নিজের নাম ঠিকানা আর গ্রাহক নম্বর (যদি থাকে) উল্লেখ করে দিতে ভুলো না। প্রশ্ন পাঠাবে ঝলমলের ঠিকানায়। উত্তর দেবেন শচীন শঙ্কর।

প্রশ্ন ঃ প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে এক ওভারে একাধিক উইকেট পেয়ে রেকর্ড কে করেছিলেন? দেবাশীষ দেব, বাগুইআটি।

উত্তর ঃ গ্লস্টারশায়ারের বোলার সি ডব্লু এল পারকার ১৯২২ সালে ব্রিস্টলে একটি ম্যাচে এক ওভারে একাই ইয়র্কশায়ারের পাঁচটি উইকেট লাভ করেন।

প্রশ্ন ঃ মস্কো অলিম্পিকে কোন দেশ কত পদক পেয়েছে? বাচ্চু দে, হাওড়া।

উত্তর ঃ অলিম্পিক শুরুর আগে ঝলমলে এ সম্পর্কে লিখেছিলাম, পড়েছো নিশ্চয়ই। তবে মস্কো অলিম্পিকের পদক জয় এবং রেকর্ড সম্পর্কে অনেকেই জানতে চেয়েছো। খুব সংক্ষেপে লিখছি কেমন—

	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
রাশিয়া	৮০	৬৯	৪৭	১৯৬
পূঃ জার্মানি	৪৭	৩৬	৪৩	১২৬
বুলগেরিয়া	৮	১৬	১৬	৪০
হাঙ্গেরি	৭	১০	১৫	৩২
পোল্যান্ড	৩	১৫	'১৪	৩২

প্রথম পাঁচটি দেশের তালিকা দিলাম। আর ভারত পেয়েছে ১টা পদক (হকিতে সোনা)। মোট ৮১ টি দেশ যোগ দিয়েছিল। ১৫ দিন ধরে ৫০ লক্ষ দর্শক খেলা দেখেছেন। আর টি ভি তে প্রায় দুশো কোটি মানুষ এবার অলিম্পিক দেখেছেন। গেমসের প্রথম দিন প্রথম ইভেন্টেই বিশ্ব রেকর্ড করে প্রথম সোনা পেয়েছেন রাশিয়ার শ্যুটার মেলেনতেভ। মজার ব্যাপার হল স্কুলের শ্যুটিং-এ ইনি লাস্ট হয়েছিলেন। এবং ওঁর শিক্ষক বলেছিলেন—তোমার দ্বারা কোনদিনই শ্যুটিং হবে না।

প্রশ্ন ঃ আমাদের কোন্ ক্রিকেটার এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলেছেন? সৌমিত্র রায় কলি-৭৪।

উত্তর ঃ এ পর্যন্ত ৬৯ টি টেস্ট খেলেছেন বিশ্বনাথ, এই সংখ্যা আরো বাড়বে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে খেলার দরুণ, ওর সর্বোচ্চ রান ১৭৯। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কানপুর টেস্টে।

প্রশ্ন ঃ মহিলা ফুটবলে বাংলা ফেডারেশন কাপে ক'বার জয়ী? সন্ধ্যা ও লিলি চক্রবর্তী মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ দু বারের এই প্রতিযোগিতায় বাংলা দুবারই জয়ী হয়েছে।

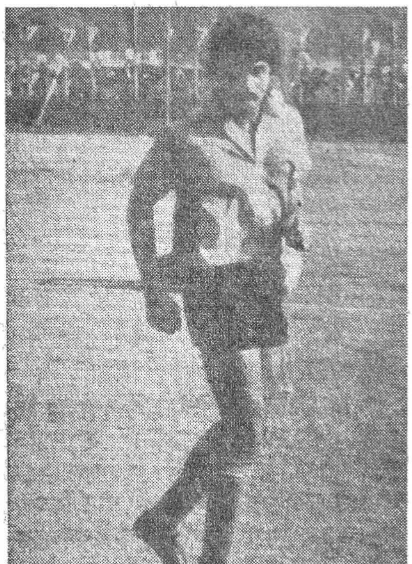
প্রশ্ন ঃ মহম্মদ হাবিব কত বছর ধরে কলকাতায় খেলছেন? জয়ন্ত ও সোমা সেন, বিরাটি।

উত্তর ঃ টানা পনেরো বছর ধরে খেলছেন। ১৯৬৬ তে ইস্টবেঙ্গলে শুরু করেন এর মধ্যে অবশ্য মোহন-বাগান এবং মহমেডানেও খেলেছেন। হাবিবের কথা ঃ "কলকাতার মায়ায় পড়ে গেছি। বিদায় নেবার দিন ভীষণ কান্না পাবে"।

ডি সি এম রোভার্স দুই-ই কলকাতায় এল

—শচীন কুণ্ডু—

বোম্বাই-এর রোভার্স কাপও কলকাতায় এলো, এর আগে দিল্লীর ডি সি এম ট্রফিও জয় করে এনেছে কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং। ডি. সি. এম এবং রোভার্স কাপ জয়ে বাংলার সুনামই অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সত্যি বলতে কি ৮০ র কলকাতার ফুটবল মরশুমটির উপর যেন শনির দশা পড়েছিল। হবে না হবে না করে যদিও বা লীগ শুরু হয়েছিল তাও সম্পূর্ণ হল না। বদলে ১৬ জন তরুণের মর্মান্তিক মৃত্যু কলকাতার ফুটবলকে কলঙ্কিতই করেছে। আর শিল্ড তো শুরুই হল না সরকার এবং আই. এফ. এ-র টালবাহানায়। এই অবস্থায় সকলেরই নজর ডি. সি. এম. রোভার্স ডুরাণ্ড ও ফেডারেশন কাপের দিকে।



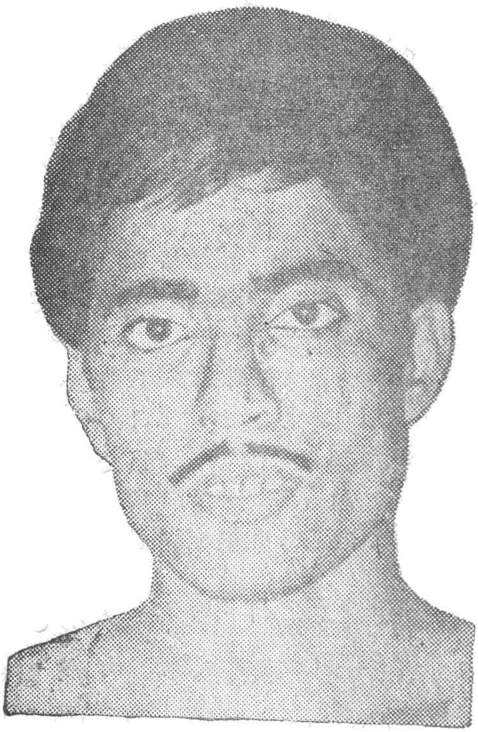
সত্যজিত মিত্র

এবার মরশুমের শুরুতে কলকাতার তিন প্রধানের মধ্যে মহমেডান এবং মোহনবাগান বেশ শক্তিশালী দলই গড়েছিল। সেদিক থেকে ইস্টবেঙ্গল অনেকাংশে ভাঙ্গা দল ছিল। শেষ পর্যন্ত সেই ইস্টবেঙ্গল টীমের জবর-দস্ত লড়াই নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য। খেলোয়াড়দের অসম্ভব মনের জোর আর লড়াই করার স্পৃহার জন্যই লাল হলুদ ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে কোচ প্রদীপ ব্যানার্জীর কৃতিত্বও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক রকম ভাঙ্গা দল নিয়েই প্রথম সাফল্য এসেছিল ফেডারেশন কাপে মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্ম জয়ের সূত্রে।

পাশাপাশি মহমেডান স্পোর্টিংও কোমর কষে লড়াই চালিয়ে দিল বৈকি। ফেডারেশন কাপের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগানের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। তখনি বোঝা গেছলো মহমেডান এবার ভারতের সেরা সেরা কয়েকটা ট্রফি ঘরে তুলবেই। হ্যাঁ, সমর্থকদের অনেক অনেক দিনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে অনেকাংশে সম্পূর্ণ করেছে ডি. সি. এম ট্রফি জয় করে। এই জয় দল এবং দলের সমর্থকদের যে উৎসাহিত করেছে তা বলাই বাহুল্য। দিল্লীর রাজপথে মহমেডান সমর্থকদের বিজয় মিছিলকে হার মানিয়ে দিয়েছে কলকাতার মিছিল। ফুলের মালা আলোর মালা বাজী পটকা মিষ্টি হাসি আর আনন্দ সবই একাকার হয়ে গেছলো জয়ের সংবাদ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে।

এরপর আবার জয় এল রোভার্সে। এবার অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে জয়ের সম্মান ভাগাভাগি করে নিতে হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম দফায় ইস্টবেঙ্গল এরিয়ানকে ৪-০ গোলে এবং দ্বিতীয় দফায় ৩-১ গোলে পরাস্ত করে সেমিফাইনালে মোহনবাগানের মুখোমুখি হয়েছিল।

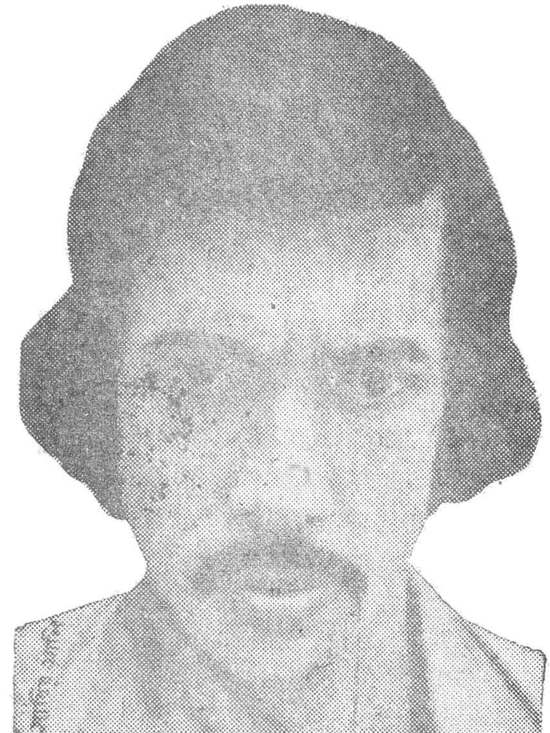
নাটকীয় উত্তেজনার মধ্যেই জমে উঠেছিল এই ম্যাচটি। আবার চিন্তাও ছিল শেষ পর্যন্ত লীগে



মানস ভট্টাচার্য

এই দলের খেলায় যে পরিণতি ঘটেছিল তেমনটি হবে না তো। উলগা এবং মানসের দেওয়া ২ গোলে পিছিয়ে থেকেও ইস্টবেঙ্গল যে ভাবে লড়াই চালিয়ে গোল শোধ করেছে তা অনেকদিন মনে থাকবে। বিরতির পর জামশেদের গোল শোধের পরে পরেই মজিদ দ্বিতীয়টি শোধ করে। রিপ্লে ম্যাচেও মোহনবাগান উলগার দেওয়া গোলে এগিয়ে ছিল কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে নি। শুরুতেই অবশ্য জামশেদ প্রায় গোল করে দিয়েছিল। দুর্ভাগ্য বলটি ক্রশবারে লেগে বাইরে চলে যায়। এর কিছু পরেই মানসের বল থেকে উলগা গোল করে। পিছিয়ে পড়েও ভেঙে পড়ে নি ইস্টবেঙ্গল। আগের ম্যাচের মতই গোল শোধ করার জেদ নিয়ে খেলতে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে মজিদের পাশ থেকে হরজিন্দার গোল শোধ করে। শুধু তাই নয়, জয়ও এনে দেয়। অবশ্য সেমিফাইনালের প্রথম ম্যাচটাই বেশি উপভোগ্য হয়েছিল। তবে দ্বিতীয় ম্যাচও জমতো, জমে নি রেফারীর দুর্বল পরিচালনার জন্যই।

ওদিকে কোয়ার্টার ফাইনালে মহমেডান প্রথম দফায় সাল গাঁওকারকে ৩-১ গোলে এবং দ্বিতীয় দফায় ৩-০ গোলে পরাস্ত করে সেমিফাইনালে ওঠে। মহমেডান এবং রোভার্স কাপ জয়ী ডেমপোর মধ্যে সেমিফাইনাল ম্যাচটিই সেরা ম্যাচ সন্দেহ নেই। যদিও মহমেডান ২ (দেবাশীষ, সাবির)—ডেমপো ২ (ম্যাচাডো, আনটাও) ম্যাচটি ড্র হয়ে যায়। রিপ্লে ম্যাচে মহমেডান ৪-০ গোলে হারিয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর রোভার্স ফাইনালে ওঠে। গোল



সাবির আলি

গত দুবারের করেছে সাবির, আকবর, উইলিয়ামসন ও দেবাশীষ। এই ম্যাচে সাবিরই হীরোর মর্যাদা পেয়েছে।

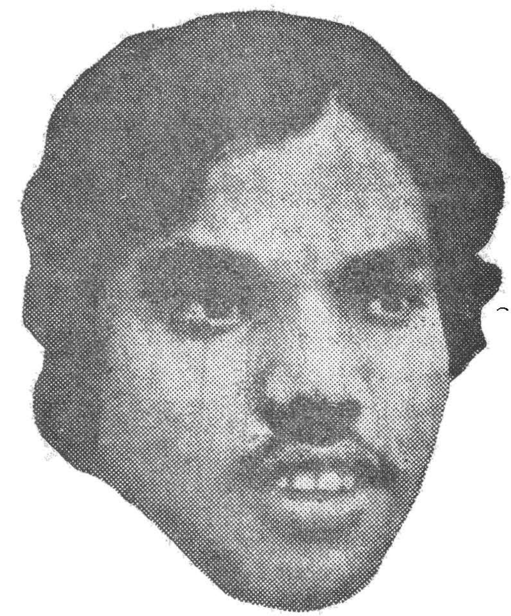
ইস্টবেঙ্গল মহমেডান কবে মুখোমুখি হবে এই প্রত্যাশা এবার মরশুমের শুরুতেই সকলের ছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা মিললো রোভার্সে। সুতরাং উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছিল ম্যাচটিকে ঘিরে। মহমেডান মোট ৯বার ফাইনালে উঠে এবার নিয়ে মোট ৪ বার জিতলো। এর আগে ৫৯ সালে ৩-০ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে রোভার্স জিতেছিল। ইস্টবেঙ্গলও ১১ বার রোভার্স ফাইনালে উঠে মোট ৮ বার চ্যাম্পিয়ান হল (তিনবার যুগ্মজয়)।

এবারের ফাইনাল ম্যাচটি বেশ দ্রুত লয়েই চলেছিল। আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে দারুণ জমে উঠেছিল। মহমেডানেরই চাপ ছিল প্রথমার্ধে। শুরুতেই কিন্তু জামশেদের হেড থেকে গোল হয়ে যাচ্ছিল।

ভাস্কর ফিসট করে বাঁচিয়ে দেয়। সুরজিতের উপর দিলীপ পালতের সতর্ক নজর থাকলেও মাঝে মাঝে কয়েকটি বল দারুণভাবেই তৈরী করে দিয়েছিলেন সতীর্থদের। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম মিনিটে আকবরই তীব্র সটে গোল করে মহমেডানকে এগিয়ে দেয়। এর মিনিট চারেক পরেই রমেনের ফিরিয়ে দেওয়া হেডটি মজিদ পেয়ে যায় আচমকাই। পেয়েই বা পায়ে সট নেয় গোল লক্ষ্য করে। ভাস্কর অবাক, মজিদও অবাক। এমনভাবে কাজ হাসিল হবে ভাবে নি। ফাইনালে সুধীর কর্মকারের খেলা আগের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। মনোরঞ্জনও কোন অংশে কমতি নয়। প্রশংসা প্রশান্ত ও রমেনেরও প্রাপ্য।

রোভার্স কাপ কলকাতায় এলো এটা যেমন আনন্দের তেমনি দুঃখের ব্যাপার হল প্রথম কারা ট্রফি রাখবে এ নিয়ে দু'দলের টানা হ্যাঁচড়া। মহমেডানের বক্তব্য: প্রথম টসে তারাই জিতেছে কিন্তু আবার টস করা হল কেন? এ ব্যাপারে ডবলিউ, আই, এফ এর সম্পাদক জিয়াউদ্দিনের বক্তব্য: প্রধান অতিথি দিলীপ কুমার প্রথমবার সঠিক নিয়মমত টস করেন নি. তাই আবার টস করা হয় এবং ইস্টবেঙ্গলই টসে জিতে ট্রফি প্রথম ছ মাস রাখার সুযোগ পায়। আর দ্বিতীয় বার টসের আগে মহমেডানের ক্যাপটেন অমলরাজ তখন আপত্তি করলেন না অথচ পরে করলেন।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য মহমেডানের সমরেশ এবং এবং ভাস্করের চেষ্টায় সমর্থকদের হাত থেকে ইস্টবেঙ্গল ট্রফি ফেরত পেয়েছে। খেলোয়াড়িতে আচরণের জন্য



মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

সমরেশ এবং ভাস্করের প্রচেষ্টাটিও রোভার্স ফাইনালের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এমন স্পোর্টসম্যান স্পিরিট যদি সকলেরই থাকতো তাহলে এমন দুঃখজনক ঘটনা খেলার মাঠের আনন্দকে ম্লান করে দিত না।

অস্ট্রেলিয়ায় ভারত

অজয় হোম

পঞ্চম খেলা। হোয়াইআল্লাতে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া কান্ট্রির বিরুদ্ধে একদিনের সীমিত ওভার খেলা। ভারত বিপক্ষ দলকে ফেলে দেয় মাত্র ১১০ রানে স্রেফ কপিল দেবের বোলিংয়ের জন্য। কপিল ৩টে উইকেট নেন মাত্র ১৩ রানে। কিন্তু নিজেদেরও তিনটে উইকেট পড়ে যায় মাত্র ১২ রানে। পাতিল (১৭) আউট হবার পর বোর্ডে ওঠে ৪ উইকেটে ৩৯। এই অবস্থায় কপিল (৩১) ভারতকে টেনে তোলেন এক অভূতপূর্ব ব্যাটিং শৌর্যে চৌহানের (২৯ নট আউট) সঙ্গে জুটি বেঁধে। পঞ্চম উইকেটে যোগ হয় ৮১ রান এবং ম্যাচ জেতে ভারত ৬ উইকেটে। এইটি নিয়ে হয় সীমিত ওভারের খেলায় দ্বিতীয় জয়।

ষষ্ঠ খেলা। মেলবোর্ন মাঠে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের বেনসন অ্যান্ড হেজেস কোম্পানির ওয়ার্ল্ড কাপ একদিনের সীমিত ওভার খেলা। খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেলা এটি। অস্ট্রেলিয়ার দুই বাঘা দ্রুত বোলার লিলি এবং পাস্কো ও মধ্যম দ্রুত গ্রাফ, এদের বিরুদ্ধে ভারতকে খেলতে হবে। অস্ট্রেলিয়া টসে জিতেও ভারতকে ব্যাট করতে দিল। মনের ইচ্ছে ভারতকে কচুকাটা করার। গোড়ায় করেও ছিল। ছটা উইকেট পড়ে গিয়েছিল মাত্র ১১১ রানে। গাভাসকার ৪, বেঙ্গসরকার ২২, শ্রীনিবাসন ৬, বিশ্বনাথ ২২, আজাদ ৪ ও কপিল দেব ৬! এই অবস্থায় সন্দীপ পাতিল (৬৪) আর কিরমানি (৪৮ নট আউট) খেলার মোড় ঘুরিয়ে ভারতকে ভদ্র অবস্থায় আনে। ৯ উইকেটে ২০৮ রান হয়। দোশি (৩২ রানে ৩), বিনি (২৩ রানে ২), পাতিল (৩১ রানে ২) আর যাউবির (৩২ রানে ১) উইকেট নিয়ে এবং বাকি রান আউট করে ১৪২ রানে খতম করে দেয় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। পাতিল 'ম্যান অফ দি ম্যাচ' হন। এই বিজয় সত্যিই প্রশংসনীয়।

ভারতীয় দল এই জেতার জন্য পায় ৩৫ হাজার টাকা। এর মধ্যে থেকে পাতিল পান প্রায় ৬ হাজার।

সপ্তম খেলা। পাথে' ওয়ার্ল্ড সিরিজের দ্বিতীয় খেলায় অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে ভারত হারাল নিউজিল্যাণ্ডকে। মাত্র ৫ রানে। কেবল দু'বল বাকি ছিল খেলা শেষ হবার। বোর্ডে ১৫৭ রান। শেষ জুটি খেলছে। ভারত ইনিংস শেষ করেছে মাত্র ১৬২ রানে। সুনীল গাভাসকার আবার অর্থাৎ তৃতীয় শূন্য করলেন হাডলির প্রথম বলে। জেতার ৬ রান বাকি। নবম খেলোয়াড় লীজ ১৬ করেছে। সঙ্গে লাস্ট ম্যান চ্যাটফিল্ড, ৬ রান তাঁর। মাঠে প্রবল উত্তেজনা। দর্শক খেলোয়াড় সবাই টেনশনে ভুগছেন। লীজ ছক্কা মারার জন্যে বিনির বলে মিড উইকেটে মারলেন তোল্লা করে। ঠিকমতো মারটা না হওয়াতে বলটা উঠে গেল উ'চুতে দু'শ মিটারের মতো। দিলীপ বেঙ্গসরকার ওই ক্যাচটি সুন্দরভাবে ধরে ভারতকে জেতালেন। 'ম্যান অফ দি ম্যাচ' হলেন হাডলি ৩২ রানে ভারতের ৫টি উইকেট নিয়ে। একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই একদিনের ৫০ ওভারের সীমিত খেলায় ভারতীয়রা পিচ এবং বোলারদের না বুঝেই অযথা ঝু'কি নিয়ে হালতুফালতু মেরে নিজেদের বিপর্যয় টেনে আনছেন। এই বদভ্যাস ত্যাগ না করলে বেনসন-হেজেস ওয়ার্ল্ড কাপ জেতা যাবে না। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য রান করেছেন—যশপাল শর্মা (২৩), পাতিল (৩৯) এবং কীর্তি আজাদ (২৯)।

অষ্টম খেলা। তিনদিনের খেলা তাসমানিয়ার সঙ্গে হোবার্ট-এ। প্রথম ইনিংসে ভারত ২৭৫ রান করে। গাভাসকার (১৯) ও বিশ্বনাথ (৪) খেলতে পারেন না। বিনি (৫১) ও ঘাউরি (৫১) করে ভারতকে একটু ভদ্রস্থ রানে নিয়ে যান। তাসমানিয়া খেলার আকর্ষণ বাড়ার জন্যে দান ছাড়ে ৫ উইকেটে ২৩৩ রানে। অধিনায়ক ডেভিসন ৭৬ রানে অপরাজিত থাকেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে গাভাসকার (৩০) ও চৌহান (৩২) করে অপরাজিত থাকেন, তৃতীয় দিনে ৭৬ মিনিট আগে খেলা শেষ হয় আলোর অভাবে। গাভাসকার ৩ উইকেটে ২২০ রানে দান ছাড়েন। দু'ইনিংসে মাত্র ২৯ রান করার পর এই ম্যাচে তিনি একটু খেললেন। দর্শকদের ১০টি চার ও একটি ছয় উপহার দিলেন ১৭৪ মিনিট উইকেটে থেকে ৮৫ রান করে। প্রথম ম্যাচে ১৫৭ করার পর এই হল তাঁর বড়ো রান। আশা করা যায় তিনি হয়তো এবার তাঁর খেলা ফিরে পাবেন! চৌহানের (৬৬) সঙ্গে জুটিতে প্রথম উইকেট জুটিতে ১৪৭ রান হয়। তাসমানিয়া দ্রুত রানের চেষ্টা না করে এক উইকেটে ৬২ করে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ করে।

নবম খেলা লনসেসটনে তাসমানিয়ার বিরুদ্ধে সীমিত ওভার একদিনের খেলায় বৃষ্টির জন্যে ৫০-এর জায়গায় ৩৫ ওভার নির্ধারিত হয়। ভারত আবার হারল। গাভাসকার ও বিশ্বনাথ দুজনেই খেলেন নি। কে যে অধিনায়কত্ব করল তা জানতে পারি নি। ভারত ৯ উইকেটে ১৪১। কীর্তি আজাদ (৩১), কপিল ২৬ মিনিট উইকেটে থেকে ৩টে চার ও একটা ছয় মারেন (৩১) আর কিরমানির রান (২২ নট আউট) ভারতকে একটু ভদ্রস্থ করে। কপিল ৮ রানে ২ উইকেট নিয়ে আশা জাগালেও তাসমানিয়া ৭ উইকেটে ১৪৩ করে জিতে যায়।

দশম খেলা হল সিডনির দ্রুত উইকেটে রাতে সীমিত ওভার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বেনসন-হেজেস ওয়ার্ল্ড কাপ। ভারতের বিরুদ্ধে মেলবোর্নের হারের শোধ তুলল অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে জিতে। লিলি (২২ রানে ২), হগ (৪৮ রানে ১), গ্রাফ (২৩ রানে ২) আর পাসকো (৩৪ রানে ২ উইকেট) নিয়ে কামাল করে দিল। টি চ্যাপেল পান ৪০ রানে ১টি উইকেট। ভারতের রান হয় ৯ উইকেটে ১৮০। অস্ট্রেলিয়া ডাইসনের (২০) উইকেট কপিলের বলে হারিয়ে রান তুলে নেন ১ উইকেটে ১৮৩। অ্যালান বর্ডার ১০৫ করে অপরাজিত থাকেন। সীমিত ওভার খেলায় বর্ডারের আগে সেঞ্চুরি করেছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাল্যান টার্নার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে, গ্রেগ চ্যাপেল দুবার। একবার ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এবং অপরটি নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। খেলার শেষে গাভাসকার বলেন, রাতের খেলায় ব্যাট করতে অসুবিধে হয় না কিন্তু ফিল্ডিং-এ হয়। একটা কথা মনে হচ্ছে এই একদিনের খেলায় বেঙ্গসরকার খুব উপযুক্ত হচ্ছেন না, তার জায়গায় অর্থাৎ ওয়ান ডাউনে শ্রীনিবাসন অনেক কার্যকরী হবেন।

১১শ খেলা ব্রিসবেনে গাব্বা মাঠে বেনসন-হেজেস খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারত হারল ৩উইকেটে মাত্র ২ বল বাকি থাকতে। ফিল্ডিং হল অকথ্য খারাপ। ক্যাচ ফেললেন মহা মহা রথীরা। শুধু কপিল অপূর্ব খেলে ৭৫ রান করে 'ম্যান অফ দি ম্যাচ' হলেন আর বল করলেন দোশি ৩০ রানে ৪ উইকেট নিয়ে। ভারত ২০৪। গাভাসকার (১) ও বিশ্বনাথ (২) দুজনেই আবার খেলতে পারলেন না। ওপেন করে চৌহান ৪৬ রান করলেন খুবই সুন্দর খেলে। নিউজিল্যাণ্ড আগের হারের বদলা নিল।

১২শ খেলা অ্যাডিলেডে বেনসন-হেজেস আন্তর্জাতিক সীমিত ওভার খেলায় ভারত নিউজিল্যাণ্ডকে চমকপ্রদভাবে হারাল ছ'রানে, তিনবল বাকি থাকতে। ভারত ৭ উইকেটে ২৩০। গাভাসকার (১৭), বেঙ্গসরকার (৩), আউট হবার পর চৌহান (৪৩) এবং যশপাল ৭২ রান করেন ১৪৩ মিনিটে ৪টি ছয় ও ৩টি চারের সাহায্যে। কপিল ২৭ ও কিরমানি (৩৯ নট আউট)। 'ম্যান অফ দি ম্যাচ'হন যশপাল। নিউজিল্যাণ্ড ২২৪। কপিল ৩৪ রানে ২, দোশিও ৩৪ রানে ২, যোগরাজ ও পাতিল একটি করে উইকেট পান।



রূপক গুপ্ত

কথা নেই বার্তা নেই, বালিশ থেকে মাথা তুলেই টুবলু ঘুমজড়ানো চোখে ঠাশ করে মানিকের গালে একটা চড় কষিয়ে দিল। আর দিয়েই অমনি আবার বালিশে মাথা রেখে ছুটে-যাওয়া ঘুমটাকে বোধ হয় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলো।

প্রাণের বন্ধু টুবলুর কাছে আচমকা এই চড় খেয়ে মানিক তো একেবারে হতভম্ব। ব্যাপারটা তাকে এতোই হকচকিয়ে দিল যে সে এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলো না! কোনো কারণ খুঁজে পেল না।

থাপ্পড়টা খুব জোরেই কষিয়েছে টুবলু। তাই মাথার ভেতরে প্রথমে একটু বোঁ-বোঁ করে উঠেছিল মানিকের। সেটা চলে গিয়ে এখন সে গালে বেশ একটা যন্ত্রণা অনুভব করছে।

টুবলুটা এমনিতেই একটু মারকুটে স্বভাবের। যার তার ওপর যখন তখন দুমদাম করে হাত চালায়। কিন্তু তাই বলে প্রাণের বন্ধু মানিককে যে ও অকারণে এভাবে মেরে বসবে তা মানিক কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবে নি। প্রথমটায় একটু হতভম্ব হলেও পরে টুবলুর ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো তার। যদি ওর সঙ্গে সে পেরে উঠতো তাহলে ওরও গালে পাল্টা এক থাপ্পড় কষিয়ে দিতো। কিন্তু তা সম্ভব নয় বলে সে চুপচাপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো বোকার মতো। তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বাইরে এসে মানিক দেখলো, টুবলুর কাকা তখনো বাগানে পায়চারী করছেন। একটু আগে যখন সে টুবলুকে ডাকার জন্যে এ বাড়িতে ঢোকে তখন তাকে দেখে উনি বলে উঠেছিলেন, 'কী ব্যাপার মানিকচন্দোর! এতো ভোরে কী মনে করে হঠাৎ।'

আসল কথাটা চেপে মানিক তখন মিথ্যে করে বলেছিল, টুবলু আর আমি মরনিং ওয়াক করতে যাবো কাকা।'

একথা শুনে টুবলুর কাকা খুব খুশী হয়ে বলেছিলেন, 'তা বেশ বেশ, খুব ভালো কথা, মরনিং ওয়াকটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভালো। আমি তো টুবলুকে কতোদিন বলেছি, অতো বেলা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে না থেকে ভোরবেলায় উঠে যদি বেড়াতে বেরোস তাহলে শরীর মন দুই-ই ভালো থাকবে। তা এতোদিনে দেখছি তোমার পাল্লায় পড়ে ওর একটু সুবুদ্ধি হয়েছে।'

টুবলুর কাকাকে দেখে তখনকার কথাগুলো মনে পড়ে যাওয়ায় মানিক যেন একটু অপ্রস্তুত হলো। মাথা নীচু করে কোনোরকমে বাগানটুকু সে পেরিয়ে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু তাকে কাঁচুমাচু মুখে একা ফিরে যেতে দেখে টুবলুর কাকার মনে কেমন যেন একটু সন্দেহ হলো। বিস্মিত হয়ে তিনি জিজ্ঞেস

করলেন, 'কী হলো মানিক? চলে যাচ্ছো যে! টুবলু বুঝি ঘুম থেকে উঠলো না!'

রাগে অপমানে লজ্জায় মানিক কোনো কথা বলতে পারলো না। মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বাগানের গেটটা খুলে বেরিয়ে এলো।

পেছন থেকে টুবলুর কাকা তখনো জিজ্ঞেস করছেন, 'কী হলো তোমার? তুমি ওরকম মুখভার করে চলে যাচ্ছো কেন? ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছো বলে টুবলু বোধহয় তোমায় কিছু বলেছে?'

মানিক যেন কথাটা শুনেও শুনতে পেল না। টুবলুর কাকা এবার যেন কতকটা নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে ও যাবে বেড়াতে! তাহলেই হয়েছে!'

বাড়ির দিকে ধীর পায়ে এগোতে এগোতে মানিক কেবলই ভাবতে লাগলো, টুবলু আজ আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলো কেন! ওর হঠাৎ এমন রেগে যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্যেই কি ও অমন রেগে গেছে? কিন্তু যার সঙ্গে আমার হলায়-গলায় এমন বন্ধুত্ব, যা দেখে আমাদের সবাই 'হরিহর আত্মা' 'মানিকজোড়' এইসব কথা বলে, সে সামান্য একটা কারণে আমার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করলো! তাছাড়া ও নিজেই তো ডাকবার জন্যে কাল আমাকে অতো করে বলে দিয়েছিল, পালেদের বাগানে আম চুরি করতে যাওয়ার ব্যাপারে ওর নিজেরই যখন অতো উৎসাহ ছিল তখন এভাবে ক্ষেপে যাওয়ার তো কোনো কারণ নেই। কাল বিকেলে খেলার মাঠ থেকে ফেরার সময় ওই প্রথম ফন্দিটা এঁটেছিল। বাগানের উঁচু পাঁচিল, আর চোমরানো গোঁফে গালপাট্টা যমদূতের মতো দেখতে দারোয়ানটার কথা ভেবে মানিক বরং প্রথমটায় যাওয়ার জন্যে রাজী হতে চাইছিল না, শেষে ওই অনেক সাধাসাধি করে তাকে রাজী করিয়েছিল, আর শেষে ওই কিনা এইরকম একটা কাণ্ড করে বসলো!

শুধু আম পাড়তে যাওয়ার ফন্দি নয়, তার পরেও তো ওর সঙ্গে আরো কত কথা হলো, কতো হাসি মশকরা। মানিকের মনে পড়ছে, কাল বাড়ি ফেরার সময় থানার মোড়ের কাছে টুবলু হঠাৎ 'আরিব্বাস!' বলে খুব চমকে উঠে রাস্তার মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তাইতে মানিকও বেশ একটু চমকে উঠে টুবলুর চোখের দিকে চেয়ে দেখলো, সে রাস্তার পাশে ভুষণ ময়রার ভিয়েনঘরটার দিকে জুলজুলে চোখে তাকিয়ে আছে। ওর দেখাদেখি মানিকও সেদিকে তাকালো। দেখলো, ভিয়েনঘরের ভেতর পেল্লায় এক বারকোশে মন খানেক সন্দেশের তাল নিয়ে দু'জন কারিগর ছাঁচে সন্দেশ তুলছে।

'ইশ! ভেতরে ঢুকে এক খাবলা যদি তুলে আনা যেতো রে!' লোলুপ চোখে সেদিকে তাকিয়ে টুবলু একসময় বলে উঠেছিল।

টুবলুর এই হ্যাংলামিপনা দেখে মানিক তার হাত ধরে টানতে টানতে বলেছিল, 'তুই তো একটা আচ্ছা পেটুকরাম রে! যখন যা দেখবি তাই কি খাবার জন্যে তোর নোলা সক্‌সক্‌ করে! এই তো এই মাত্তোর ঝালচানা আর আলুকাবলি খেলি! সেগুলো পেটে গিজ্‌ গিজ্‌ করছে!'

টুবলু একথার কোন জবাব না দিয়ে সরে এসেছিল সেখান থেকে! তারপর হাঁটতে হাঁটতে যেন কতকটা নিজের মনেই বলে উঠেছিল, 'সত্যিরে, আমার বড়ো ক্ষিদে, পেটের মধ্যে সব সময় যেন খাই-খাই করে। এর জন্যে জেঠিমার কাছ থেকে কতো মুখনাড়া শুনতে হয়। বলে, আমি নাকি অলক্ষুণে, এই রাক্ষুসে নোলার জন্যেই নাকি ছেলেবেলায় বাপ মাকে খেয়েছি, এই রকম আরো কতো কথা।'

এসব কথা মানিক এর আগেও টুবলুর মুখে অনেকবার শুনেছে! তাই বাপ-মা-হারা এই বন্ধুটির জন্যে সে নিজেও খুব দুঃখ বোধ করে! শুধু সে নয়, তার মা, বাবা, দিদি প্রত্যেকেই টুবলুকে খুব ভালবাসে! টুবলুর এই খাই-খাই বাতিকের কথা জানে বলে ও তাদের বাড়িতে গেলেই মা এটা ওটা ওকে খেতে দেয়। আর টুবলুও কোনোরকম সংকোচ না করে বেমালুম তা খেয়ে নেয়। মানিক এতে খুশীই হয়।

কিন্তু কাল টুবলুর এসব কথা শুনে সে তাকে বলেছিল, 'তা জেঠিমা যখন তোকে এতো মুখনাড়া দেয় তখন স্বভাবটা একটু শোধরালেই তো পারিস।'

'পারি না রে—কিছুতেই পারি না! থেকে থেকে শুধু মনে হয় পেটের ভেতরে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে।' একটু থেমে টুবলু এরপর বলেছিল, 'যাক্‌গে ওসব কথা, এখন বল্‌, কাল তাহলে ঠিক যাচ্ছিস তো?'

'বললুম তো যাবো।'

'তাহলে ভোরবেলায় তুই আমায় ডাকতে আসিস।'

'কিন্তু অত ভোরে গিয়ে ডাকলে তোর জেঠিমা আবার আমায় বকুনি দেবে না তো?'

'দূর, আমি তো নীচে বাইরের ঘরে কাকার কাছে শুই। কাকা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাগানে পায়চারি করে।'

টুবলুর কথা শুনে মানিক এরপর একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিল; টুবলুর এই কাকা মানুষটি খুব ভালো। টুবলুকে খুব ভালোবাসেন বলে টুবলুর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গেও সবসময় হেসে হেসে কথা বলেন। বিশেষ করে মানিকের সঙ্গে টুবলুর খুব মাখামাখি বলে মানিককে তিনি যেন একটু বেশী স্নেহ করেন।

স্কুলের মাঠ থেকে ফেরার পথে টুবলুদের বাড়িটা আগে পড়ে। কাল বাড়িতে ঢোকার আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে টুবলু আরেকবার বলেছিল, 'তাহলে ঠিক আসিস কিন্তু।'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ—নিশ্চয় আসবো।' মানিক জবাব দিয়েছিল।

তারপর টুবলুর কথামত আজ খুব ভোরে উঠে মানিক ওকে ডাকতে গিয়েছিল। গিয়ে দ্যাখে সত্যি সত্যিই ওর কাকা আদুল গায়ে বাগানে পায়চারী করছেন। সে ওর কাকার কাছে মনরাখা গোছের মিথ্যে অজুহাত দিয়ে ঘরের ভেতর টুবলুকে ডাকতে গিয়েছিল। আর ঘরে ঢুকেই সে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল—যখন সে দেখলো, একটা হাত আর পা দিয়ে পাশবালিশটাকে জড়িয়ে ধরে টুবলু তখনো ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। ব্যাপারটা দেখে কেমন যেন একটু হাসিও পেল মানিকের; ভাবলো, আচ্ছা ছেলে যাহোক! কাল নিজেই অতো করে মতলব আঁটলো, অতো উৎসাহ দেখালো, অন্ধকার থাকতে বেরুবে বলে, অমন করে বললো, অথচ এখন নিজেরই কোন চাড় নেই! ভোঁস ভোঁস করে দিব্যি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে!

টুবলু দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমোচ্ছিল। মানিক তাই চৌকির ওপর ঝুঁকে পড়ে টুবলুর গায়ে ঝাঁকি দিয়ে তার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করলো। মুখেও 'এই টুবলু—টুবলু' বলে ওর নাম ধরে ডাকলো। কিন্তু বার দুই ডাকার পরই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটা ঘটে গেল; কোনো কথা নেই বার্তা নেই, টুবলু বালিশ থেকে মাথা তুলেই ঘুমজড়ানো চোখে ঠাস্‌ করে মানিকের গালে একটা থাপ্পড় ক'ষয়ে দিল।

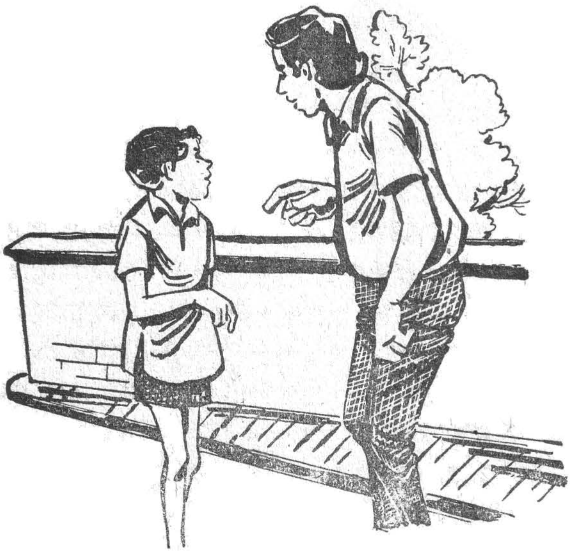
কিন্তু কেন যে এভাবে মারলো সেট আর কিছুতেই জানা গেল না। কেননা মারার আগেও টুবলু যেমন কোনো কথা বলে নি, মারার পরেও সি কিছু বললো না। বালিশে মাথা রেখে আগে সে যেমন ঘুমোচ্ছিল, চড় মেরেই তেমনি চুপচাপ আবার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলো। ব্যাপারটা তাই মানিকের কাছে কেমন যেন হেঁয়ালী হয়ে রইলো; কিছুতেই বুঝতে পারছে না সে, কাল বিকেলেই যে তার সঙ্গে অমন হেসে-খেলে কথা বললো, আজ তার ভেতর হঠাৎ কী এমন ব্যাপার ঘটলো যে তাকে এভাবে মেরে বসলো! তবে কি তার নামে মিথ্যে করে ওর কাছে কেউ চুকলি কেটেছে? তাদের দুজনের ভাব-ভালোবাসা দেখে যারা হিংসেয় ফেটে মরে ওদের ভেতরেই কি কেউ একাজ করেছে? কিন্তু তা যদি করেই থাকে তবে টুবলুই বা কেমন যে ভালো করে ব্যাপারটা যাচাই না করেই দুম করে তাকে এভাবে মেরে বসলো!

ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পারলেও টুবলুর ওপর প্রচণ্ড রাগ আর অভিমান হচ্ছে মানিকের। অভিমান হচ্ছে আরো এই কারণে যে, যার সঙ্গে তার এতো ভালোবাসা এতো মাখামাখি, যাকে সে কতোদিন কী খাইয়েছে, ঝালচানা, আলুকাবুলি, ঘুগনি, পকৌড়ি, আলুর চপ, বেগুনি, ঝালমুড়ি—যখনই সে যা খেতে চেয়েছে তাই খাইয়েছে, আর তার প্রতিদানে সে কিনা আজ এরকম ব্যবহার করলো তার সঙ্গে?

মানিক মনে মনে সংকল্প করলো, ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের এইখানেই ইতি। আর কোনোদিন আমি আমি ওর সঙ্গে কথা বলবো না; ও নিজের ভুল বুঝতে পেরে হাজার সাধাসাধি করলেও নয়। সে ঠিক করলো, আজ থেকে সে স্কুলে অন্য বেঞ্চে বসবে, এমন জায়গায় গিয়ে বসবে যেখান থেকে ওর সঙ্গে একদম চোখোচোখি

না হয়। কিন্তু সেদিন স্কুলে গিয়ে সে দেখলো, টুবলু আসে নি। যাক ভালোই হয়েছে তাহলে—এই ভেবে সে যেখানে এতোদিন বসেছে সেখানেই এসে বসলো। ভাবলো, টুবলু যদি পরে আসে তাহলে ও নিজেই যেখানে হোক ওর বসার জায়গা বেছে নেবে। আমি কেন মরতে ভালো জায়গাটা ছেড়ে দেব!

টুবলু কিন্তু স্কুলে এলো না সেদিন। তাইতে মানিক একটু আশ্চর্য হলেও মনে মনে বেশ স্বস্তি পেল।



টুবলুর কাকার সঙ্গে রাস্তায় মানিকের দেখা।

সেদিন ছুটির পর সে যখন বাড়ি ফিরছে তখন টুবলুর কাকার সঙ্গে রাস্তায় দেখা। উনি তাকে দেখতে পেয়ে এখন আবার জিগ্যেস করলেন, 'হ্যাঁরে মানিক, সকালবেলায় টুবলুকে ডাকতে এসে তুই অমন মুখ কাঁচুমাচু করে ফিরে গেলি কেন। কী হয়েছে বল্।"

সকালবেলায় লজ্জায় আর অপমানে টুবলুর কাকার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছিল মানিক; কিন্তু এখন তার মনে হলো, কথাটা ওঁকে বলাই উচিত। টুবলু খামোকা তার গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিল, আর এর জন্যে ও কারুর কাছে শাস্তি পাবে না—এটা মানিক কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। তাই সে এখন সবিস্তারে টুবলুর কাকাকে সমস্ত কথা জানালো। সব শোনার পর টুবলুর কাকা খুব বিস্মিত হয়ে বললেন, সে কিরে! বলা নেই কওয়া নেই—তোর গালে এমনি এমনি একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিল। ওর মাথাটাথা কিছু খারাপ হয়েছে না কি!'

মানিক কোনো জবাব দিল না। পথ চলতে চলতে টুবলুর কাকা এবার আপন মনেই বলতে লাগলেন, ছোঁড়া তো ভারি বদ্ হয়েছে দেখছি! দাঁড়া, আজই আমি ওকে খুব করে বকে দেবো। আর তোর কাছে যাতে ক্ষমা চায় আমি তারও ব্যবস্থা করবো।

টুবলুর কাকার এই সমস্ত কথায় মানিক মনে মনে একটু খুশী হলো তাঁর ওপর। ভাবলো, উনি যখন বলেছেন তখন নিশ্চয় এর একটা বিহিত করবেন।

কিন্তু পরের দিনই যখন ওঁর সঙ্গে আবার দেখা হলো তখন উনি বললেন, 'হ্যাঁ রে মানিক, শোন্, টুবলুকে তো আমি বলেছিলাম, তা টুবলু কি বললো জানিস! বললো, তুই নাকি ওর খুব ক্ষতি করেছিস!'

'ক্ষতি করেছি!' মানিক যেন আকাশ থেকে পড়লো।

টুবলুর কাকা বললেন, 'হ্যাঁ, ওতো সেই কথাই বললো। বললো, এতো ক্ষতি করেছিস যে তা সহজে পূরণ হবে না।'

'না কাকা, আমি এই চোখ ছুঁয়ে, মাকালীর দিব্যি গেলে বলছি, আমি ওর কোনো ক্ষতি করি নি। ও সব মিথ্যে কথা বলেছে।' মানিক খুব জোর দিয়ে কথাটা বললো।

টুবলুর কাকা বললেন, আমারও সেইরকম মনে হয়েছে, তাই বার বার ওকে জিজ্ঞেস করেছি কী তোর ক্ষতি করেছে তা আমাকে খুলে বল্, তারপর বিহিত করা যায় কিনা আমি চেষ্টা করে দেখবো, তা কিছুতেই ও আসল কথাটা বলতে চায় না। বললেই বলে—সে সব কথা আপনাকে বলা যাবে না। তা আমি তো ভেবে পাচ্ছি না, কী এমন ওর ব্যাপার—যা আমাকে বলতে বাধছে।'

একটু থেমে টুবলুর কাকা এবার বললেন, 'তা মানিক, তুই বাবা একটু খেয়াল করে দ্যাখ্ দিকি নি, হয়তো তোর অজানতে এমন কিছু ব্যাপার ঘটে গেছে—যা ওর কিছু ক্ষতি করতে পারে।'

মানিক আগের মতোই তেমনি মাথা নেড়ে বললো, 'না কাকাবাবু, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি ওর কোনো ক্ষতি করি নি।'

'তাহলে কি ও আমায় মিথ্যে কথা বললো!'

'হ্যাঁ কাকাবাবু, একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে। যদি সত্যিই আমি ওর কোনো ক্ষতি করে থাকি, তাহলে ও খুলে বলুক যে কী ক্ষতি আমি করেছি! তা বলছে না কেন!'

'ঠিক আছে, ওকে আমি আরো জেরা করবো, তুই দুঃখ করিস নে কিছু, তোর নামে মিথ্যে বদনাম দিয়ে ওকে আমি পার পেতে দেবো না।'

সেদিন টুবলুর কাকা এতো সব কথা বললেন বটে, কিন্তু তারপর তিন-চার দিন কেটে গেল অথচ তিনি কী যে বিহিত করলেন তা মানিক কিছুই জানতে পারলো না। এদিকে ক্লাশে টুবলুর সঙ্গে রোজই তার দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে। অবিশ্যি চোখাচোখি হলে মানিক রাগে ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু তবু সে বেশ বুঝতে পারে যে, টুবলু তার সঙ্গে ভাব করার জন্য ভেতরে ভেতরে খুব উসখুস করছে। যেন মানিক চোখমুখ থেকে রাগ-রাগ ভাবটা একটু মুছে নিলেই ও সাহস করে তার দিকে এগোতে পারে, কথা বলতে ভরসা পায়। বিশেষ করে মানিক যখন টিফিন পিরিয়ডে রাস্তার ধারে বাদাম গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে ঝালচানা, আলুকাবলি বা চটপটি ভাজা কিনে খায় তখন টুবলু একটু তফাতে কোথাও দাঁড়িয়ে বার বার কেমন যেন চোরা চাউনীতে তার দিকে তাকায়। তখন ওর ভেতর সেই উসখুস ভাবটা যেন আরো বেড়ে যায়, যেন ওর ভেতরকার সেই লোভী আর পেটুক মনটা বারবার আফশোষ করে আর নিজেকে ধমকায়,—কেন মরতে সেদিন অমন কান্ড করলুম!

টুবলুর ওপর মনে রাগ থাকা সত্ত্বেও ওর এই রকমসকম দেখে মাঝে মাঝে মানিক কেমন যেন মজা পায়। আর তাই ওর নোলায় যাতে আরো বেশী করে জল আসে সেজন্য সে আলুকাবলির টকু-ঝালে জারানো আলুর চাকাগুলো কাঠিতে গেঁথে ওকে বেশী করে দেখিয়ে দেখিয়ে খায়,সেই সঙ্গে তার জিভের টকাস্-টকাস্ শব্দটাও আরো বেড়ে যায়।

এতে টুবলুর নোলায় যতো জল বাড়ে, রাগও ততো বেড়ে যায়। কেননা সে বেশ বুঝতে পারে যে আলুকাবলি খেতে সে খুব ভালোবাসে বলে মানিক ইচ্ছে করেই এ সমস্ত করছে। ফলে এক সময় সে রেগে গিয়ে এবং মনে মনে বুঝিবা মানিককে গাল পাড়তে পাড়তে সেখান থেকে সরে পড়ে।

ব্যাপারটা শুধু মানিকের নয়, ক্লাশের আরো দু'-একজন ছেলের নজরে পড়েছিল এবং তারাও যেন এটায় বেশ মজা পেত। কিন্তু যাকে নিয়ে এই মজা তার মনের রাগ বা প্রতিক্রিয়াটা যদি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ না পায় তাহলে মজাটা যেন ষোল আনা হয় না। তাই একদিন টুবলুকে খুঁচিয়ে দেবার জন্য ক্লাশের সেরা ফাজিল ছেলে ভন্টো বললো. 'এই টুবলু, দেখেছিস মাইরী—মানিকটা কী ত্যাঁদোড়! রোজ তোকে দেখিয়ে দেখিয়ে আর মুখে টকাস-টকাস শব্দ করে কেমন আলুকাবলি খায়। ও যেন মনে করেছে, তাহলেই তুই হ্যাংলার মতো গিয়ে ওর কাছে আলু-কাবলি খেতে চাইবি।'

'ওর আলুকাবলি খাওয়া আমি জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেবো। মনে করেছে আমি বুঝি ওর শয়তানী কিছু বুঝতে পারি না।' টুবলু রেগে বলে ওঠে।

এরপর মানিকের পক্ষ নিয়ে পলাশ টুবলুর কথার প্রতিবাদ জানায়। বলে, 'ও নিজের পয়সায় আলু-কাবলি খাচ্ছে, এতে তোর তো রাগ করার কিছু নেই! ওকে আলুকাবলি খেতে দেখলে তোর মন যদি এতই আনচান করে তাহলে ওর দিকে তুই তাকাবি না! আর তা যদি না পারিস তাহলে ওর কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে ওর সঙ্গে ভাব কর্।'

টুবলু এতোক্ষণে বুঝতে পারে, সবাই মিলে তাকে রাগাবার জন্যেই ওরা এত কথার পাঁয়তাড়া কষছে। তাই সে এবার গালাগাল দিয়ে পলাশকে তেড়ে যায় পাগলের মতো।

এইরকম একদিন নয়, আরো কয়েকদিন ছেলেরা তার পেছনে লাগলো। আর সেও ক্ষেপে গিয়ে তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করলো। এরপর দেখা গেল টুবলুর সামনে কেউ যদি 'আলুকাবলী' কথাটা উচ্চারণ করছে, তাহলেই টুবলু অমনি ক্ষেপে গিয়ে তাকে যাচ্ছেতাই করে গালমন্দ করছে। টুবলুর এই ক্ষেপে

যাওয়া দেখে মানিকও মনে মনে খুব মজা পায়। হাসে আর মনে মনে ভাবে, এবার না ওর মাথাটা খারাপ হয়ে যায়!

এরপর মাসখানেকের জন্যে গরমের ছুটি পড়ে যাওয়ায় টুবলুকে নিয়ে ক্লাশের ছেলেদের এই মজা করাটা বন্ধ হয়ে গেল। আর টুবলুও যেন দিনকতকের জন্যে রেহাই পেল ওদের হাত থেকে।

এরপর এই গরমের ছুটির ভেতর মানিক একদিন আবিষ্কার করলো, সত্যি সত্যিই টুবলুর মাথা খারাপ হওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

মানিকদের বাড়ির সামনে দিয়েই বাজারে যাবার রাস্তা। টুবলুকেও মাঝে মাঝে এই রাস্তা দিয়ে বাজারে যেতে দেখে মানিক। একদিন সকালে সে যখন দোতলার বারান্দায় বসে হোম-টাস্কের অঙ্ক কষছে তখন হঠাৎ তার চোখে পড়লো, টুবলু একহাতে বাজারের থলে এবং আর একহাতে খাটো একটা কঞ্চি নিয়ে, সেই কঞ্চিটা একনাগাড়ে মাথার ওপর বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে ঘোরাতে রাস্তা দিয়ে চলছে, চলতে চলতে মাঝে মাঝে কেমন যেন চমকে ওঠার ভঙ্গী ক'রে এদিক-ওদিক চাইছে।

ব্যাপারটা মানিককে এমন অবাক করলো যে, সে অঙ্ক কষা ফেলে রেখে একভাবে চেয়ে রইলো ওর দিকে। তারপর যতক্ষণ না ও রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল ততক্ষণ ওকে দেখতে লাগলো।

ঠিক পরের দিনও মানিক একই ব্যাপার দেখতে পেল। একহাতে বাজারের থলে, আর একহাতে সেই খাটো কঞ্চিটা মাথার ওপর বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে ঘোরাতে টুবলু রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। আজ আবার ইস্টিশানের কুলিদের মতো মাথায় গামছা দিয়ে একটা পাগড়ি বেঁধেছে। এই সাজে ওকে ঠিক যেন দেখাচ্ছে নিধিরাম সর্দারের মতো। আর মাথার ওপর বাঁই বাঁই করে কঞ্চি ঘোরাতে দেখে মানিকের মনে পড়ে যাচ্ছে প্যানা-পাগলার কথা।

প্যানা-পাগলার আসল নাম পান্নালাল দে। থানার মোড়ে ছিমছাম চেহারার একটা মনোহারী দোকান ছিল তার। একদিন হঠাৎ দেখা গেল, লোকটা পাগল হ'য়ে গিয়ে হাতে একটা ছ'পটি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর চলতে চলতে রাস্তায় যতো ল্যাম্পপোস্ট আর গাছ পড়ছে সেগুলোকে হাতের ছ'পটি দিয়ে জোরে জোরে বাড়ি দিচ্ছে আর মুখে মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছেড়ে বলছে, 'মারো!' প্রবল আক্রোশে কাউকে চাবকানোর সময় চোখ-মুখের যেমন চেহারা হয় পান্নালালের চোখে মুখেও সেইরকম ভয়ংকর ভয়ংকর ভাব। কিছুদিন এইভাবে ঘুরে বেড়ানোর পর সেই পান্নালালকে তার বাড়ির লোকেরা বুঝি পাগলা-গারদে ভর্তি করে দিয়ে আসে। পরে সেখানেই পান্নালাল মারা যায়।

আজ দু'দিন ধরে টুবলুকে মাথার ওপর বাঁই বাঁই করে কঞ্চি ঘুরিয়ে পথ চলতে দেখে মানিকের কেন যেন সেই প্যানা-পাগলার কথাই মনে পড়ে গেল, মনে হলো, টুবলুর সেই দশা হয়েছে। তফাতের মধ্যে প্যানা-পাগলা উত্তেজিত হয়ে হাতের ছ'পটিটা দিয়ে গাছের গুঁড়িতে আর ল্যাম্পপোস্টে বাড়ি দিতো, আর এ শুধু ঝ'পটিটা বাঁই-বাঁই ক'রে মাথার ওপর ঘোরাচ্ছে।

মানিক ভাবলো, এরকম যদি করতে থাকে তবে টুবলুকেও তো ওর বাড়ির লোকেরা পাগলাগারদে একদিন ভর্তি করে দিয়ে আসবে। মানিক শুনেছে, সেখানে নাকি পাগলদের খুব মারধোর করে, খুব কষ্ট দেয়। অনেকে বলে এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আর মারধোরের চোটেই নাকি প্যানা-পাগলা সেখানে মারা গেছে। টুবলুরও যদি সেরকম কিছু হয়!

এসব কথা ভাবতে গিয়ে আজ হঠাৎ মানিকের বুকের ভেতরটায় মোচড় দিয়ে উঠলো। শক্ত ড্যালার মতো কী একটা আটকে রইলো গলার কাছে। মনটা তার হু-হু করে উঠলো। ছলছলে চোখে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো, 'হে ভগবান্, তুমি টুবলুকে তাড়াতাড়ি ভালো করে দাও। ওকে যেন প্যানা-পাগলার মতো পাগলাগারদে গিয়ে মরতে না হয়। ও যদিও আমার গালে সেদিন একটা থাপ্পড় কষিয়েছে ব'লে আমি ওর ওপর খুব চটে গিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমি বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছি যে, আমাকে থাপ্পড় মারার পেছনে রয়েছে ওর এই মাথা খারাপ হওয়ার লক্ষণটা। লক্ষণটা সেদিন বা তার আগে থেকেই হয়তো আস্তে আস্তে ওর ভেতর শেকড় গেড়েছে। নইলে তার আগে ও তো খুব ভালো ছেলেই ছিল। ওর মত দুর্জয় সাহসী আর প্রাণখোলা

ছেলে বড়ো একটা দেখা যায় না। আমি তো ওর মতো প্রাণের বন্ধু আজ পর্যন্ত একটাও পাই নি।

টুবলুর কথা ভেবে সেদিন সারাটা সকাল আর দুপুর মানিকের খুব মনখারাপ অবস্থায় কাটলো। টুবলুর কথা ভাবতে গিয়ে ওর জীবনের অনেক খুঁটি-নাটি দুঃখের কথাও ঘুরে ফিরে মনে পড়তে লাগলো তার। মনে পড়লো কী কারণে একদিন টুবলুকে ওর জ্যাঠামশায় খুব মেরেছিলেন, তাইতে নিজের মা-বাবা নেই ব'লে টুবলু সেদিন সাহেবপুকুরের ধারে ব'সে কী কান্নাটাই না কেঁদেছিল। ওর এই কান্না দেখে মানিক সেদিন বুঝেছিল যে, বাইরে ছেলেটা যতই হাসিখুশী আর ডানপিটেগিরি ক'রে বেড়াক, ভেতরে ও সবসময় একটা দুঃখ-কষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছে, যেটাকে ও কারুর কাছে এতদিন প্রকাশ করে নি, মানিক ওর প্রাণের বন্ধু বলে কেবল তার কাছে ও আজ সব কথা খুলে বলেছে।

সেদিন ওর কান্না আর দুঃখকষ্টের কথা শুনে মানিকেরও চোখে জল এসে গিয়েছিল। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে নিজের ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে টুবলুর মন থেকে দুঃখ কষ্ট মুছে ফেলার চেষ্টা করবে।……সেদিনের সেই প্রতিজ্ঞার কথা ভেবে আজ মানিকের খুব মন খারাপ করতে লাগলো। কেননা আজ আর কিছু করার উপায় নেই তার, টুবলুর এই রকম একটা অবস্থাতে সে যে ওর কাছে গিয়ে একটু দাঁড়াবে—সে-পথটুকু পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। অগত্যা বাড়ি বসে ভগবানের কাছেই বারবার তাকে প্রার্থনা জানাতে হয়; টুবলু যাতে তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠে, প্যানা-পাগলার মতো যাতে না ওকে পাগলা গারদে গিয়ে মরতে হয়—এই প্রার্থনাই সে সারাটা সকাল আর দুপুর করলো। আর মনে মনে ঠিক করলো, আজ বিকেলে সে একবার টুবলুদের প্রতি-বেশী নীলাঞ্জনদের বাড়ি যাবে। ওর কাছে গেলে ও হয়তো টুবলুর অনেক খবর দিতে পারবে তাকে।

এইসব কথা মনে করে সেদিন বিকেলে মানিক সত্যি সত্যি নীলাঞ্জনদের বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। তারপর নীলাঞ্জনদের বাড়ির কাছাকাছি যখন এসে পড়েছে তখন পেছন থেকে 'মানিক—এই মানিক' বলে টুবলুর কাকার ডাক শুনে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

টুবলুর কাকা তাঁদের পাড়ার লাইব্রেরীতে বসে ছিলেন, মানিককে দেখতে পেয়ে ডাক দিয়েছেন। মানিক ভাবলো, এমন হাঁকপাক করে যখন ডাক দিয়েছেন তখন উনি নিশ্চয় টুবলুর ব্যাপার নিয়ে কিছু বলবেন। কিন্তু সে কাছে যেতে উনি জিগ্যেস করলেন, 'কী রে, কোথায় যাচ্ছিস?'

'একটু নীলাঞ্জনদের বাড়ি যাবো কাকা।' টুবলুর কাকার মুখের দিকে একভাবে চেয়ে থেকে মানিক জবাব দিল।

টুবলুর কাকা হাসতে হাসতে বললেন, 'ও তাই, আমি ভাবলুম বুঝি আমাদের বাড়ি যাচ্ছিস।'

একটু থেমে টুবলুর কাকা এবার মানিকের পিঠে হাত রেখে জিগ্যেস করলেন, 'তা তোদের এই মন কষাকষি আর কতোদিন চলবে?'

মানিক কোনো জবাব না দিয়ে টুবলুর কাকার মুখের দিকে চেয়ে থেকে যেন কিছু একটা খুঁজতে চাইলো। টুবলুর কাকা হাসতে হাসতে বললেন, তোর গালে চড় মারার ব্যাপারটা নিয়ে আমি তার পরেও অনেকদিন টুবলুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, তা ও বরাবর যা বলে এসেছে সেসব কথা আমি তো তোকে বলেছি; তুই কী যে ওর ক্ষতি করেছিস সেটা আর কিছুতেই বলতে চায় না। কিন্তু কাল আবার জিগ্যেস করতে কী বললে জানিস? বললে, মানিক যদি নিজে এসে আমার কাছে জানতে চায় তাহলে আমি শুধু ওকেই সেকথা বলতে পারি, তাছাড়া আর কাউকে আমি বলবো না।…তা মানিক, তুই একবার আমাদের বাড়িতে চল্ না লক্ষ্মীটি।'

কাকার মুখে টুবলুর মনের ইচ্ছেটা জানতে পেরে মানিকের কেন যেন মনে হলো, টুবলুর এসমস্ত কথা-বার্তার ভেতরেও একটা পাগলামী-পাগলামী ভাব রয়েছে, কথাগুলো যেন ঠিক প্রকৃতিস্থ মনের নয়। তাই সে দুম্ করে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো, 'কাকাবাবু, টুবলু কেমন আছে?'

মানিকের এই প্রশ্ন করার ধরনে টুবলুর কাকা যেন বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, 'কেমন আছে মানে! বেশ ভালোই আছে। শুধু তোর সঙ্গে আড়ি হয়ে যাওয়ায় ওর মনটা যা একটু খারাপ।'

'আর কিছু নয় ?' মনের সন্দেহ ঘোচাবার জন্যে মানিক তবু আরেকবার জিগ্যেস করলো।

টুবলুর কাকা তেমনি বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'কেন—আবার কী হবে!'

মানিক এবার একটু আমতা আমতা করে বললো, 'না, মানে দু'দিন ধরে দেখছি ও কেমন যেন পাগলের মতো সব সময় মাথার ওপর বাঁই-বাঁই করে একটা কঞ্চি ঘোরাতে ঘোরাতে রাস্তা দিয়ে হাঁটে, আজ আবার দেখলুম, মাথায় গামছা দিয়ে একটা পাগড়িও বেঁধেছে, তাই আমি ভাবলুম—'

'ও বুঝি পাগল হয়ে গেছে।' মানিকের কথার বাকী অংশটুকু বলে দিয়ে টুবলুর কাকা হো-হো করে হাসলেন খানিকটা। তারপর হাসতে হাসতেই আবার বললেন, আরে না না—তা নয়, এখন ব্যাপারটা হয়েছে কী জানিস, আমাদের জামরুল গাছে একটা কাগের বাসা হয়েছিল, তা ও পরশুদিন একটা লগি দিয়ে দুষ্টুমী করে বাসাটা ভেঙে দিয়েছে, আর যায় কোথা, সেই থেকে কাগেরা ওর পেছনে লেগেছে, ও যেখেনেই যায় ওরাও ঠিক পিছু পিছু ধাওয়া করে, মাথায় ঠোকর দেয়। তাই কাগের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে এখন ওকে ওইভাবে বাইরে বেরুতে হচ্ছে।'

'ওমা তাই বুঝি!' বিস্ময়ের সুরে কথাটা বলতে গিয়ে মানিক নিজেও হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়লো।

তারপর তার হাসি থামলে টুবলুর কাকা বললেন, 'চ—যাবি নাকি আমাদের বাড়ি ?'

যদিও মানিকের মন আগের থেকে অনেকটা হালকা হয়েছে, তবু চট করে সে কোনো জবাব দিতে পারলো না। টুবলুর কাকা আবার বললেন, 'চলু চলু, তুই গেলে ও খুব খুশী হবে। ও মনে মনে চাইছে যে তুই একবার যা। তাছাড়া কেন সেদিন বেমক্কা অমন একটা কাণ্ড করে বসেছিল—সেটাও তো তোর একবার জানা দরকার। নইলে চিরকাল তোদের ভেতর এই ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকবে নাকি!

টুবলুর কাকার এই কথায় মানিক ভাবলো সত্যিই তো, টুবলু যখন নিজেই ওর কাকাকে বলেছে যে একমাত্র তাকেই ও সেই ক্ষতির কথাটা জানাবে, তখন সে একবার সেখানে গেলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়, আর এই ফাঁকে তাদের এই বিবাদটাও অমনি মিটে যায়। তবে আর যেতে মিছিমিছি এতো সংকোচ করছে কেন!

মানিককে চুপ করে থাকতে দেখে টুবলুর কাকা এরপর তার হাত ধরে তাকে একরকম টানতে টানতেই ও'দের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

টুবলু বাড়িতেই ছিল। সে কাকার ঘরে বসে ছিঁড়ে-যাওয়া গুলতিটাকে মজবুত করে বাঁধছিল। কাকার সঙ্গে মানিককে ঘরে ঢুকতে দেখে তার চোখে মুখে লজ্জার হাসি ফুটে উঠলো, ঘরে ঢুকে কাকা বললেন, 'টুবলু, এই তোর বন্ধুকে ধরে নিয়ে এলাম। তুই ওকে যেসব কথা বলবি বলে আমায় জানিয়েছিলি, সেগুলো এখন ওকে বলে ফ্যাল্। আমি না হয় কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যাচ্ছি এই বলে কাকা সত্যি সত্যিই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং যাবার সময় যথারীতি দরজাটাও বন্ধ করে দিলেন।

কাকা চলে যাওয়ার পর একটু ইতস্ততঃ করে টুবলুই প্রথম কথা বললো, 'হ্যাঁ রে, সেদিন তোর গালে চাঁটিটা কি খুব জোরে লেগেছিল ?'

'লাগবে না! তুই কি কম জোরে মেরেছিস নাকি! একটু থেমে মানিক এবার বললো, 'কিন্তু কী ব্যাপার বল্ তো ? এমনি আমায় চাঁটিটা মেরে তুই আবার তোর কাকাকে বলেছিস, আমি তোর খুব ক্ষতি করেছি বলেই নাকি চাঁটিটা আমাকে মেরেছিস!—এসব কী কথা!'

'সবই সত্যি কথা, এতোটুকু মিথ্যে নয়।' টুবলু হাসতে হাসতে জানালো।

মানিক বললো, 'কিন্তু কী ক্ষতি তোর করেছি—সেটা বল্ ?'

'সে অনেক ক্ষতি রে—অনেক ক্ষতি, সেসব দুঃখের কথা তোকে বলে আর কী হবে!'

'না, তবু আমি শুনতে চাই।'

'শুনবিই তাহলে ?'

'হ্যাঁ, শুনবো।'

খানিকক্ষণ ধরে কী যেন চিন্তা করলো টুবলু। তারপর বললো, 'ঠিক আছে বলছি, কিন্তু আমার ভাই একটা অনুরোধ, এসব কথা তুই আর কারুকে বলতে পারবি না।'

'আচ্ছা, বলবো না, তুই বল্।'

টুবলু তবু এদিক-ওদিক সতর্ক চোখে একবার তাকালো। তারপর মানিকের খুব কাছে সরে এসে আস্তে আস্তে বললো, 'তুই সেদিন আমার একটা ভালো ভোজ খাওয়া ভণ্ডুল করে দিয়েছিস।'

'ভোজ!' মানিক যেন আকাশ থেকে পড়লো।

টুবলু বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ ভোজ, মানে একেবারে ভোজের মতো ভোজ.—দই সন্দেশ, রাবড়ি, চমচম পান্তুয়া, ল্যাংচা, ক্ষীরমোহন, রসোমালাই—কী না ছিল সেদিন! এইসব পেয়ে যখন মনের আনন্দে আমি খেতে শুরু করবো, ঠিক তখুনি তুই হতভাগা গিয়ে আমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলি। ওই অবস্থায় ঘুম ভেঙে গেলে তখন কার মেজাজ আর ঠিক থাকে বল ?'

টুবলু বললো, 'তুই হাসছিস! অথচ আমার তখন যা মনের অবস্থা হয়েছিল সে আর তোকে কী করে বোঝাবো।

স্বপ্ন ছুটে যাওয়ার ব্যাপারটা যে পেটুক আর লোভী টুবলুকে কতোখানি কষ্ট দিয়েছে তা বুঝতে পেরে মানিক এবার হাসতে হাসতে বললো, 'ঠিক আছে, দুঃখু করিস না, এবার একদিন সত্যি সত্যিই তোকে ভোজ খাওয়াবার ব্যবস্থা করছি—সেদিন যতো তুই খেতে চাস ততো খাওয়াবো।' শ্রাবণ মাসের দু'তারিখেই দিদির বিয়ে লাগছে।'

'আব্বিববাস।' বলে টুবলু মনের আনন্দে মেঝের ওপরেই একটা ডিগবাজি খেল।

রামায়ণী তত্ত্ব

অমিয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী

গবেষণা করছি নিয়ে রামায়ণের তত্ত্ব ;
খেটে খেটে বার করেছি হরেক রকম তথ্য।
রাজ্য ছিল রাবণ রাজার ;
লঙ্কা কেন নাম হ'ল তার ?
আসল কথা, লঙ্কা সেথায় ফলতো—এটা সত্য!

লঙ্কাপোড়ার ধোঁয়া দিয়ে মেঘের সৃষ্টি করতো;
তার আড়ালে শত্রু-সাথে মেঘনাদ খুব লড়তো!
যুদ্ধ সে তো ক'তো একা ;
যেতো নাকো ধোঁয়ায় দেখা ;
ইন্দ্রেরও হায় চলতো নাকো সেথায় আধিপত্য!

ভস্মলোচন পিপে পিপে ভস্ম ক'রেই লঙ্কা,
ধোঁয়া দিয়ে শত্রুসেনার জাগাতো খুব শঙ্কা।
লঙ্কাদহন করতে এসে
বীর হনুমান হেঁচে-কেসে
পোড়া মুখেই পালিয়ে গেল ঝাঁঝেই হয়ে মত্ত!

সেবার যখন কোটি পিপে লঙ্কা পোড়ার ধুমটা
কুম্ভকর্ণে হলো দিতে ভাঙতে অকাল ঘুমটা!
ফুরিয়ে গেল লঙ্কা যত
তাই সে হলো যুদ্ধে হত;
পালাতো রাম নয়ত ছেড়ে সীতা দেবীর স্বত্ব!



মালী এবং সুমালী যেই যুদ্ধে পটল তুললো,
লঙ্কার চাষ আর কে করে? চাষবাস সব ভুললো।
তাই তা রাবণ হল নিপাত ;
গেল মাথা, কুড়িটা হাত ;
জানে এসব বাল্মীকি কি মধুসূদন দত্ত ?



সুদীপ্ত প্রামাণিক

বিখ্যাত শিকারী ভিমাপ্পার মুখেই শুনেছিলাম আজকের এই শিকার কাহিনী। জাতিতে ইহুদী। নানা রকম দুঃসহ কষ্টের মধ্যে দিয়ে ওঁর জীবন গেছে। উনি বলেন, ভোগবিলাসের মাধ্যমে তোমরা যে আনন্দ পাও কষ্টের মাধ্যমে আমি তার চেয়ে অনেক আনন্দ পাই। এখানে বলে রাখা ভালো যে কষ্ট বলতে আমি অর্থনৈতিক কষ্টের কথা বলছি না, বলছি শারীরিক কষ্টের কথা। নিতান্ত সাধারণ জীবন যাপনেই উনি অভ্যস্ত, কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যা তার মোটেই নেই। নানা প্রতিকূল অবস্থায় যেখানে আমাদের মতন সাধারণ লোকেরা মোটেই থাকতে পারে না সেখানে ভিমাপ্পা অবলীলায় কাটিয়ে দেন। আর এটাই হচ্ছে ওঁর শিকারী জীবনের সব থেকে বড় সম্পদ। আর আছে ওঁর প্রচণ্ড সাহস।

এই ভিমাপ্পার বয়স এখন অনেক হয়ে গেলেও শিকারী জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যান নি। তাই মাঝে মাঝে নেশাটা জেগে উঠলেই এই বয়সে তাঁকে ছুটতে হতো। এই মানুষটার অভিজ্ঞতার ঝুলিটি নেহাত ছোট ছিলো না। তাই থেকেই আমাদের মাঝে মাঝে কিছু উপহার দিতেন উনি। তার মুখ থেকেই শোনা যাক ঘটনাটা।—

শিকারের কাহিনী তোমাদের অনেক বলেছি। কিন্তু আজ যে শিকারের কথা বলব সেটা মামুলি হলেও আমার জীবনের এক অন্যতম শিকার। শিকারী জীবনে আমাকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, অনেক দুঃখ সইতে হয়েছে কিন্তু সেবারে আমি যা হারিয়েছি তার দুঃখ আমি কোনদিন ভুলতে পারব না, আজীবন আমাকে সে দুঃখ সইতে হবে।

লেপার্ড বা চিতাবাঘটির সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রামে নামার আগেও বেশ কয়েকবার দেখেছিলাম চিতা বাঘটিকে।

তখন আমি ছিলাম চিঙ্গাটুসিয়ার ফরেস্ট বাংলোয়। আদৌ শিকারের উদ্দেশ্যে আমি ওখানে যাই নি, মূল উদ্দেশ্য ছিল সুন্দর মুক্ত পরিবেশে শরীরটাকে একটু জিরিয়ে নেওয়া। ভোরবেলা বেড়ানো আমার বহু দিনের অভ্যাস, সেখানেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। নিয়মানুযায়ী সেদিনও বেড়িয়েছিলাম। চার পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে হাঁটছিলাম। দুধারে ঘন বন। মাঝখানে বন কেটে তৈয়ারী করা হয়েছে ছোট ছোট পাথর-বিছানো রাস্তা। যদিও জানতাম, এ বনে বাঘ নেই, তবুও হাতি ভাল্লুক, গোর-বাইসন বা শম্বরের তো অভাব নেই তাই অভ্যাসবশেই রাইফেলটা কাঁধে চড়িয়ে নিয়েছিলাম। মাঝেমাঝেই সেইসব বনাধিবাসীদের রাস্তা পার হতে দেখা যাচ্ছিল। রাস্তা মোটেই চওড়া নয়. একটা জীপ যাওয়ার মতন সরু রাস্তা কিন্তু ওই রাস্তাটুকুই ওরা বেশ সমঝে পার হয়। কেন জানি না অপূর্ব লাগছিল সকালটা। ভোরবেলাকার পাখিদের ডাক আর সূর্যের সামান্য মিঠেরোদ উপভোগ

করতে করতে করতে কখন যেন রাস্তা ছেড়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। আপনমনে হাঁটছিলাম আর চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ নাকে এল একটা বোটকা গন্ধ, অভিজ্ঞ শিকারীর কাছে এই গন্ধের একটিই অর্থ যে ধারে কাছে নিশ্চয়ই বাঘ আছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এই বনে বাঘ থাকবার কথা নয়। এই বন পেরিয়ে উত্তরে প্রায় মাইল পঞ্চাশেক পরে যে বনটা আছে সেখানে বাঘ আছে জানি। নিশ্চয়ই ক্ষুধার তাড়নায় কিংবা তাড়া খেয়ে এখানে এসে পড়েছে। যাই হোক সাবধান হয়ে এগোতে লাগলাম। একটা বাঁক ঘুরতেই নজরে এল একটা চিতাবাঘ। চিতাবাঘটি স্ত্রী চিতা। সে তার দুই বাচ্চার সঙ্গে খুব জমিয়ে খেলা লাগিয়েছে এবং সম্ভবতঃ এইজন্যই আমার উপস্থিতি তখনো পর্যন্ত তার নজরে আসে নি। বাচ্চাগুলির তখনো চোখ ফোটে নি, ভারী চমৎকার লাগছিল দেখতে। পিঠে রাইফেল থাকা সত্ত্বেও কেন যেন সেটা হাতে আনলাম না, আস্তে আস্তে ফিরে এলাম বাংলোয়।

ফিরে এসে ব্যাপারটা জানালাম জুডুকে। এদিকটা দেখাশোনার ভার জুডুর ওপরই ন্যস্ত। কথাটা যদিও সে অবিশ্বাস করল না। কিন্তু তেমন গা করল না। বললো ওপরওয়ালাকে জানাতে হবে এবং তার নির্দেশ মতই কাজ করা হবে। সুতরাং আমিও সে ব্যাপারে আর যাই নি।

এর পরে প্রায় মাস দুয়েক কেটে গেছে, আমিও এখান থেকে যাব যাব করছি, কিন্তু গণ্ডগোলটা বাধলো সেই সময়ই। হঠাৎ একদিন স্থানীয় একদল আদিবাসী এসে জানালো যে গতকাল রাত্রে তাদের একটা গাই বাঘের কবলে পড়ে মারা গেছে। বলা বাহুল্যই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটি সেই চিতাবাঘটির কাজ, তবে সে যে শেষপর্যন্ত লোকালয়ে হানা দেবে এটা ভাবি নি। এর মধ্যে কয়েকবার চিতাবাঘটির সঙ্গে আমার মোলাকাৎ হয়ে গেছে তবে সম্পর্কটা দূরে দূরেই ছিল, সামনাসামনি হলে কি হতো বলা মুশকিল। যাই হোক খবরটা শুনেই জুডুর টনক নড়ল, সেও ব্যাপারটা বুঝল এবং চাকরি বাঁচাবার জন্য যথেষ্ট তৎপরতাও আরম্ভ করে দিল।

কিন্তু ব্যাপারটা এখনেই মিটল না, এরপর থেকে প্রায়ই খবর আসতে লাগল যে অমুক পশুটি বাঘের কবলে পড়েছে অথবা অমুক পশুশালায় বাঘ হানা দিয়েছিল। অদ্ভুত ব্যাপার, বনে এত জন্তু জানোয়ার থাকতে চিতাটির নজর কেন যে লোকালয়ের পশুর দিকে সেটা আমার বোধগম্য হল না। লোকালয়ে পশুর প্রতি কি ওর কোন আক্রোশ ছিল?—কে জানে! আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে চিতাটি কখনও মানুষকে আক্রমণ করতো না। এমনও দেখা যে চিতাটির শিকারের দু'হাত দূরে একটা শিশু ঘুমিয়ে রয়েছে কিন্তু চিতাটি ভুলেও সেদিকে দৃষ্টিপাত করে নি।

ইতিমধ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে রটে গিয়েছিল যে বাংলোয় একজন শিকারী বহাল তবিয়তে বাস করছে। অতএব তারাও দল বেঁধে আমার কাছে আসতে লাগল। আমিও তাদের না বলি নি, তবুও না বা হ্যাঁ কিছু না বলেই তাদের ফিরিয়ে দিয়েছি, তার কারণ তখন আমার শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছিল না।

কিন্তু তখনও কল্পনাও করি নি যে চিতাটির পরের আক্রমণের লক্ষ্য হবে আমাদের দিকে। সেদিন সন্ধেবেলা বাংলোর সামনের লাল ইজিচেয়ারে বসে চা খাচ্ছিলাম। কেন যেন সেদিন মনটা এক অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল। অবশ্য তার কারণও যে ছিল না তা নয় বাড়ী থেকে একটা শুভ সংবাদ আসাই হল এর কারণ। সন্ধেটা বেশ সুন্দর লাগছিল আর লক্ষ্য করলাম আমার প্রফুল্লতা আমার প্রিয় কুকুর ডিগের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। এখানে বলে রাখি যে আমার এই ডিগ ছিল আমার একান্ত প্রিয় কুকুর হলেও পুত্রের মতনই তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। আর আমি যেখানে থাকতাম আমার প্রাণের দোসরের মতনই এই ডিগও থাকতো আমার সঙ্গে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, পড়ন্ত রোদের মিঠে আবেশ আর অসংখ্য পাখির কলকাকলি উপভোগ করতে করতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম আমি। ডিগ তখন সামনের বাড়ী দিয়ে ছোটাছুটি করছিল। ছুটতে ছুটতে কখন যে ডিগ বনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল খেয়াল করি নি। চমক ভাঙলো একটা তীক্ষ্ন আর্তনাদে। চমকে উঠলাম আমি, এ আর্তনাদ তো আমার প্রিয় ডিগের। লাফিয়ে উঠে দৌড়লাম। ঘটনাটা এত আকস্মিক ঘটে গিয়েছিল যে পাশেই ছিল আমার চিরসঙ্গী রাইফেল

সেটাও সঙ্গে নেওয়া হয় নি। আর্তনাদ কিন্তু একবারই শোনা গিয়েছিল। এবার আমি ধাঁধায় পড়লাম। আর্তনাদ এসেছিল একটা দিক থেকে। আমি সে দিক ধরেই দৌড়াচ্ছি কিন্তু এর শেষ কোথায় তাতো জানি না। এত ঘন বন যে কিছুই চোখে পড়ছে না, তার ওপর রোদ্দুরও তখন চলে গেছে। বেশ খানিকটা চলে গিয়েছিলাম, ফিরে আবার উল্টো দিকে দৌড়লাম, একবার ডান দিকে যাচ্ছি একবার বাঁ দিকে যাচ্ছি, তখন আমি দিশেহারা।

অবশেষে নজরে এল ডিগের প্রাণহীণ দেহটি। একটা ঝোপের মধ্যে পড়ে রয়েছে। ডিগকে মারা হয়েছে অন্ততঃ বিশ হাত দূরে, কারণ সেখানে পড়ে



উল্টে পড়ে গেল বাঘটা।

রয়েছে তার চাপচাপ রক্ত। তারপর সেখান থেকে আনা হয়েছে এখানে, মাটিতে রক্তের ঘষটানো দাগ এখনো স্পষ্ট। বোটকা গন্ধটা এখনো যায় নি, বুঝতে অসুবিধে হল না যে আমার প্রিয় ডিগকে মেরেছে সেই শয়তান বাঘটা। তার প্রচণ্ড থাবায় বেচারী ডিগের মুণ্ডুটা ধড় থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলে রয়েছে। চারদিকে চাপ চাপ রক্ত। চোখ ফেটে জল আসছিল। প্রাণহীন ডিগের দেহের তাজা রক্ত স্পর্শ করে তখনই শপথ করলাম যে এই চিতাকে যতক্ষণ না মারছি ততক্ষণ আমি জলস্পর্শও করবো না। এরপর ডিগকে তুলে একপাশে সরিয়ে রাখলাম। কোমরে ছিল ভোজালি, নরম কাদামাটি দ্রুত কাটতে শুরু করলাম। আর তাকে কবর দিয়ে বাংলোয় ফিরে এলাম।

রাত হয়ে গেছে। বাংলোতে ফিরে এসে রাইফেলটা কাঁধে চড়ালাম, এরপর সোজা চলে এলাম সেই ডিগের কবরস্থানে। সামনের বিরাট ঝাঁকড়া গাছটিতে চড়ে বসলাম। এখানে বসার উদ্দেশ্য হলো যে আমার স্থির বিশ্বাস বাঘটা ডিগকে মেরে ওখানে টেনে এনে ফেলে রেখেছিল, কারণ পরে এসে খাবে বলে। আর নিশ্চয়ই এখনো সে আসে নি, কারণ এখানে আমার অনুপস্থিতি ছিলো মাত্র মিনিট পনের। আর ডিগকে মারবার পর তো এখনো একঘণ্টাও যায় নি।

কিন্তু বাঘের দেখা নেই, এর মধ্যে প্রায় দু'ঘণ্টা কেটে গেছে। রাত ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, চারদিকে জন্তুর আওয়াজ আর ঝিঁঝিঁপোকার ডাক এবং মশার গুনগুনানি। মাঝে মাঝে মাথার ওপর ছেপকা বা নাইটজার পাখিগুলো ডেকে উঠছিল। হাতে আমার থ্রি সিক্সটিসিক্স বোরের ম্যানলিকার রাইফেল, অনেক দূর থেকেও মারা যাবে। কিন্তু আসল বস্তুরই যে দেখা নেই। চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তবে কি সে কিছু আন্দাজ করেছে?

মাথার আমার তখন আগুন জ্বলছে, চারদিক থেকে যেন ভেসে আসছে সেই আর্ত চিৎকার। চোখের সামনে ভেসে উঠছে ডিগের প্রাণহীন রক্তাপ্লুত দেহটা। তার দেহের রক্ত এখনো আমার হাতে জামায় মাখামাখি।

হঠাৎ নাকে এলো সেই বিশ্রী বোটকা গন্ধটা। সোজা হয়ে বসলাম, আমার শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরা দপ দপ করছে, তীব্র প্রতিহিংসায় তখন আমি কাঁপছি।

বাঘটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পড়েছে। খুঁজছে ডিগকে। নয়তো বিপদের আন্দাজ করেছিল ও। এদিক সেদিক চাইলো তারপর হঠাৎই আমার দিকে দৃষ্টি পড়ে গেল। গুলি করলাম আমি। বিকট গর্জন করে আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে উল্টে পড়ে গেল বাঘটা। আবার গুলি করলাম একটা দুটো তিনটে চারটে। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলাম আমি। পাঁচ-পাঁচটা গুলি খাওয়ার আগেই নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল বাঘটা। লাফিয়ে নামলাম আমি গাছ থেকে, দুহাত দিয়ে বাঘের পিছনের পা দুটো তুলে ধরলাম।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনলাম, চমকে পিছন ফিরলাম আমি। আমার দুদিক থেকে দুটো ক্ষুদে বাঘের বাচ্চা লাফিয়ে পড়লো আমার পিঠের ওপর। বুঝতে পারলাম এ দুটো এই নিহত বাঘেরই বাচ্চা।

কিছু বুনো লতা জোগাড় করে বেঁধে ফেললাম বাচ্চা দুটোকে। তারপর সোজা বাংলোয় ফিরে এলাম।

পরে বাচ্চাদুটোকে আমারই এক বন্ধু বায়োলজিস্টকে দিয়ে দিয়েছিলাম। মাতৃদুগ্ধের অভাবে বাচ্চাদুটি অবশেষে মৃত্যুবরণ করেছিল।

ভাজা ইলিশ

অমর রাউত

টাটকা দুটো ইলিশ নিয়ে
মণ্টি দিদির বর,
পিসু-শাশুড়ীর বাড়ি গেলেন
বিহারে, দেওঘর।
পিসু-শাশুড়ী মন্ত্র নিয়ে,
মাছ, মাংস ছোঁনু না।
'দেখন-হাসি' আর 'আয়েসী'
শ্বাশুড়ীর দুই কন্যা।
রান্না ঘরে দরজা দিয়ে
ভাজছে ইলিশ মাছ,
মুখে পুরে গরম ইলিশ
দুই কন্যার নাচ।
জামাইবাবু জানলা দিয়ে
আড়ি পেতে দেখে,
চক্ষু হলো ছানাবড়া,
গালেতে হাত রেখে।





(উত্তরপ্রদেশের লোককথা)

কোন এক সময়ে একটা ইঁদুর ছিল। ইঁদুরটা সুযোগ পেলেই অন্যের উপকার করতো। একদিন ইঁদুরটি পথ দিয়ে যাবার সময়ে এক টুকরো জ্বালানী কাঠ দেখতে পেলে। সে কাঠটিকে নিয়ে এসে নিজের বাড়ীতে রেখে দিল।

পরদিন যখন সে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, তখন সে একজন দরিদ্র স্ত্রীলোককে দেখতে পেল। স্ত্রীলোকটি তার উনুনে আঁচ ধরাবার জন্য খুব চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না আর তাই খুব কাঁদছিল। ইঁদুরটা স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়ে বললে, হ্যাঁগা তুমি কাঁদছ কেন?

স্ত্রীলোকটি বললে, কি করি, আমার রান্নার কোন কাঠ নেই। তাই উনুন ধরাতে পারছি না, রান্না করবো কি করে? শুধু ঘুঁটে রয়েছে, কিন্তু কাঠ না থাকায় কিছুতেই আগুন ধরছে না আর ধোঁয়ায় আমার চোখ জ্বলছে। এখন আমি কি যে করি।

স্ত্রীলোকটির দুঃখ শুনে ইঁদুরের মন গলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার গর্ত থেকে কাঠ এনে তাকে দিলে। স্ত্রীলোকটিও তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে কাঠ জ্বেলে রুটি তৈরী করলে। কাঠ এনে দেওয়ার জন্যে একটা রুটি ইঁদুরটা পেলে।

রুটি পেয়ে ইঁদুর ভারী খুশী। যখন খুশী মনে ইঁদুর রুটিটা নিয়ে যাচ্ছে এমন সময় দেখলে মাটিতে উপুড় হয়ে কুমোরের ছেলেটা পড়ে কাঁদছে। তার কান্নার কারণ সে কিছু খেতে পায় নি। ছেলেটার মা, মানে কুমোরের বউ ছেলেটাকে খুব বকছে। বেচারী হাতের কাজ শেষ না করে কিভাবে খাবার তৈরী করে?

এসব দেখে ইঁদুরটার বড় মমতা হল। সে তাড়াতাড়ি তার রুটিটা ছেলেটাকে খেতে দিল। এতে কুমোরের বউ খুব খুশী। খুশী হয়ে সে ইঁদুরকে একটা মাটির পাত্র দিল।

ইঁদুরতো মহা খুশী। খুশী; তার কারণ ক্ষুধার্ত ছেলেটাকে সে খেতে দিতে পেরেছে আর তাছাড়া একটা বড় মাটির পাত্রও সে পেয়েছে।

খুশী মনে পাত্রটাকে সামনে গড়াতে গড়াতে নিয়ে চলল সে। বেশী দূর যায় নি সে. ইতিমধ্যে তার নজরে পড়ল কাছের একটা পুকুর। পুকুরের চারদিকে ধোপারা কাপড় কাচছিল। পুকুর ছাড়িয়ে যেতে না যেতে ঝগড়ার শব্দ তার কানে এল। ইঁদুর দেখলে এক ধোপা তার বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করছে। ধোপা একটা লাঠি দিয়ে তার বউকে মারছিল আর বেচারী ধোপানী কাঁদছিল। ইঁদুরের কৌতূহল হল ব্যাপারটা জানতে। তাদের কাছে গিয়ে সে ঝগড়ার কারণ জানতে চাইলে।

ধোপা বললে—দেখ না আমি যে পাত্রে কাপড় কাচার জন্যে জল ফোটাই সেইটা ভেঙ্গে দিয়েছে। এখন কি করে আমি কাপড় কাচি? এদিকে ঘরেও একটা পয়সা নেই। কাপড় কাচলে তবে কিছু রোজগার হয়। ওই দেখ ময়লা কাপড়ের পাহাড় জমে রয়েছে।

বেচারী ধোপানীর জন্যে ইঁদুরেব বড় করুণা হল। কারণ ধোপানী ছিল বড় রোগা। তার ওপর ধোপার মারের ফলে তার গায়ে লাঠির দাগগুলো দিব্বি দেখা যাচ্ছিল। ইঁদুর তখন তার পাত্রটা ধোপাকে দিয়ে দিল। আর বললে—খবরদার আর কিন্তু ধোপানীকে তুমি মারবে না। এই পাত্রে এখন তুমি কাপড় কাচার জন্যে জল গরম করতে পরেবে।

ধোপা তো মহা খুশী। খুশী হয়ে ইঁদুরকে সে একখানা পশমের কোটই দিয়ে দিল। ইঁদুরও কোটটি পেয়ে খুশী মনে আবার পথ চলতে শুরু করলে।

কিছুদূর যাবার পর এক পর্যটককে ঘোড়ার চড়ে আসতে দেখলে। লোকটি শীতে ভীষণ কাঁপছিল। ইঁদুর তাকে দেখে থামলে। ঘোড়ায় চড়ে পথ চলছে লোকটি, অথচ তার গায়ে কোন গরম পোশাক নেই দেখে ইঁদুর বড় অবাক্ হল। সে লোকটিকে বললে—কি আশ্চর্য ব্যাপার তোমার ঘোড়া কেনার মত টাকা ছিল অথচ নিজের জন্যে একটা কোট জোটাতে পার নি! লোকটি বললে—আমার বড় ভাই বড় নিষ্ঠুর। আমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্যে জোর করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমাকে কোন জামা কাপড় দেয় নি। ফলে যে জামাটা পরা দেখছ এইটাই আমার এখন সম্বল! এই কথায় ইঁদুরের মনটা ভিজে গেল। সে তাড়াতাড়ি ধোপার কাছ থেকে পাওয়া কোটটি লোকটিকে দিয়ে দিল। লোকটাও খুব খুশী হয়ে ইঁদুরকে বললে—আমার ঘোড়ার কোন দরকার নেই। আমি যাচ্ছি কাছের শহরে বাস করতে। এখান থেকে শহর খুব বেশী দূরে নয়। তা তুমি আমার এই ঘোড়াটি নিয়ে যাও। এই বলে সে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। কয়েক মাইল মাত্র গিয়েছে কি না গিয়েছে ঘোড়ার পিঠে চড়া ইঁদুর একটি সাজগোজ-করা করা লোককে একটা বাজনা কাঁধে নিয়ে খুব বিমর্ষ ভাবে বসে থাকতে দেখলে। ইঁদুর লোকটিকে দেখে থামলে। তারপর জিজ্ঞেস করলে তুমি কি ভাই বিয়ে করতে চলেছ, কাঁধে তোমার বিয়ের বাজনা দেখছি। কিন্তু তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?

লোকটি বললে—তুমি ঠিকই বলেছ, আমি বিয়ে করতে চলেছি। কিন্তু বিপদ হয়েছে কি কোন গাড়ী ঘোড়া পাচ্ছি না। এদিকে সময়মত না পেঁছাতে পারলে কনে পক্ষরা রাগ করে ফিরে যাবে।

ইঁদুর বললে—তা এর জন্য তুমি ভাবছ কেন, এই নাও আমার ঘোড়া। আমার এতে কোন দরকার নেই। আমি হেঁটেই যেতে পারব।

এইকথা শুনে বরটির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সে ইঁদুরের ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। তারপর বললে তুমি আমার অনেকখানি উপকার করলে, তোমায় আর আমি কি দোব। এক কাজ কর, আমার সঙ্গে যে বিয়ের বাজনাটা রয়েছে এই ঢোলটা তুমি বরং নাও। এর শব্দ ভারী মিষ্টি। তুমি যখন আসছিলে তখন তোমার গান শুনতে পাচ্ছিলাম। তা এই ঢোলটা তোমার কাজে লাগবে। ইঁদুর খুশী হয়ে ঢোলটি নিয়ে গান করতে করতে বাড়ী ফিরে চলল।—

উঠোন থেকে আমি পেয়েছিলাম এক টুকরো কাঠ,
সেই কাঠটি দিলুম একজন বুধোকে।
বুধো তার পরিবর্তে আমায় দিল রুটি—
সেই রুটি আবার আমি দিলুম কুমোরের ছেলেকে।
কুমোর আমায় দিল মাটির পাত্র;
সেই পাত্র আবার দিলুম ধোপাকে।
ধোপা আমায় দিল পশমের জামা—
সেই জামা দিলুম ঘোড়ার চড়া এক শীতার্তকে,
সেই লোকটি আবার দিল তার ঘোড়া,
ঘোড়াটিকে দিলুম এক বরকে।
বরটি দিল তার ঢোল।
কেমন মজা, কেমন মজা, কেমন মজা।



ছোট সংসার। বাপ আর মেয়ে। মেয়েটা নেহাৎই ছোট। এগারো গিয়ে বারোয় পা দিয়েছে। তবে বুদ্ধিতে বুড়ো বাপকে হার মানায়। মেয়ে ছাড়া বুড়োর একটা উট, ঘোড়া আর একটা গাধা ছিল। খুব কষ্টে দিন চলে। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে যে কটা পয়সা পায় তাই দিয়ে কষ্টে সৃষ্টে দুমুঠো জোগাড় হয়। একদিন জঙ্গল থেকে কাঠ এনে উটের পিঠে বোঝাই করে বাজারে বেরোয় বিক্রীর জন্যে। দাঁড়াতেই একজন খদ্দের এসে বলে, 'কত দাম কাঠ-গুলোর ?'

'কত আর, তিন ডিলাম' (রাশিয়ান মুদ্রা)

'মাত্র তিন ডিলাম! আচ্ছা, আমি তোমায় দশ ডিলাম দেবো। কি খুশী তো ?'

বুড়ো ত অবাক্, এ'কটি কাঠের দাম দশ ডিলাম। মহা আনন্দে কাঠগুলো নিয়ে চললো খদ্দেরের ডেরায়। কাঠগুলো নামিয়ে দিতেই খদ্দের তার হাতে গুঁজে দিল দশ ডিলাম। দাম নিয়ে পা বাড়াতেই উটটাকে আটকে দিল খদ্দেরটি। কি ব্যাপার ? জিজ্ঞেস করে বুড়ো।

'উটটাও তো কিনেছি কাঠের সঙ্গে। না হলে কি এমনি এমনি তিন ডিলামের মাল দশ ডিলামে কিনেছি।

মহা ফাঁপরে পড়ে বুড়ো। শেষ পর্যন্ত দুজনে গেল কোর্টে—মীমাংসার জন্যে। সব শুনে জজসাহেব রায় দিলেন। উটটা তুমি পেতে পার না। তিন ডিলামের জায়গায় দশ ডিলাম দিয়ে কাঠের সঙ্গে উটটাও কিনেছে ও। এটা ওরই প্রাপ্য। বেচারা বুড়ো কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরল শুধু হাতে।

পরের দিন ঘোড়ার পিঠে করে কাঠ নিয়ে আবার বাজারে গেল। চড়া দাম দিয়ে কাঠগুলো কিনে নিল সেই খদ্দেরটি। এবারও সেই একই যুক্তি দিয়ে ঘোড়াটা আটকে দিল। দুজনে আবার গেল জজের কাছে। জজ সাহেব কিন্তু ক্রেতার অনুকূলে রায় দিলেন। শুধু কাঠ নয়, কাঠের সঙ্গে যা কিছু আছে সবই তার। সুতরাং ঘোড়াটির মালিক ঐ ক্রেতা। অনেক কাকুতি-মিনতি করল ঘোড়াটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে। না, কিছুতেই কিছু হল না। বোকার মতো উট আর ঘোড়াটা খুইয়ে দারুণ মুষড়ে পড়ে

বুড়ো। কি করবে ভেবে পায় না। অগত্যা শুধু হাতেই বাড়ী ফিরল। ফিরে সব কথা মেয়েকে বলল। সারারাত চিন্তা করে মাথায় এক ফন্দী এলো মেয়েটার।

পরের দিন বাবা যখন গাধার পিঠে কাঠ বোঝাই করে যাবার উদ্যোগ করছে তখন কাছে গিয়ে মেয়েটা বলল, 'আজ আর তোমার গিয়ে কাজ নেই। কাঠ নিয়ে আমিই বাজারে যাব। দেখি কি হয়।'

গাধার পিঠে কাঠ নিয়ে চলেছে মেয়েটি। বাজারে দাঁড়াতেই খদ্দেরটি কাছে এসে বলে, পাঁচ ডিলাম



সজোরে তার কবজিটা ধরে ফেলল মেয়েটা

দেবো। কাঠ সমেত যা কিছু আছে সব দিতে হবে। রাজী? লোকটার চালাকি বুঝতে দেরী হয় না। মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, তবে কিনা এক শর্তে'। 'শর্ত' আবার কি?' জবাব দেয় খদ্দেরটি, মেয়েটি বলল, 'দামের সঙ্গে যা কিছু সব দিতে হবে।' অতশত না বুঝে রাজী হয়ে গেল খদ্দেরটি। গাধার পিঠে করে কাঠ পেঁাছে দিল লোকটার গোলায়।

কাঠগুলো নামিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'গাধাটা কোথায় রাখবো?' 'ঐ ঐ কোণে এক ধারে' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তারপর ট্যাঁক থেকে দাম বের করে যেই না মেয়েটার হাতে দিতে যাবে অমনি সজোরে তার কবজিটা ধরে ফেলল মেয়েটা। 'আঃ, ছাড় ছাড়, হাত ধরছো কেন?' চেঁচিয়ে ওঠে লোকটা। মুচকি হেসে মেয়েটি জবাব দেয়, 'দামের সঙ্গে ওটাও দিতে হবে। চুক্তি খেলাপ করলে চলবে না। অর্থের সঙ্গে যা কিছু থাকবে সবই আমার পাওনা। হাতটা বাদ দিয়ে দাম নিই কি করে?'

'তা কি করে হয়? কাঠের দাম পাঁচ ডিলাম— সেটাই পাবে। হাতটা কেন?' কাঠের সঙ্গে উট ঘোড়া গাধা বিক্রী হলে দামের সঙ্গে হাতটা পাব না কেন?' লোকটার চমক ভাঙ্গে। নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে। অনেক তর্কাতর্কির পর ঠিক হ'ল জজ সাহেবের কাছে যাব। দু'তরফের বক্তব্য শুনে জজ সাহেব বল্লেন, 'মেয়েটির কথাই ঠিক। দামের সঙ্গে হাতটাও দিতে হবে।' রায় শুনে পা'দুটো জড়িয়ে ধরলো জজ সাহেবের। মেয়েটি কিন্তু নাছোড়বন্দা। শুধু দাম নেবে না।

শেষ পর্যন্ত আপোষ হল—'হাতের বদলে পাঁচশো ডিলাম দিতে হবে মেয়েটাকে। উট, ঘোড়া আর গাধাটিও ফেরত দিতে হবে।' অগত্যা গুনে গুনে পাঁচশো ডিলাম দিতে হল লোকটিকে। সেই সঙ্গে উট, ঘোড়া ও গাধাটিও।

শীত

অমিতাভ বসু

শীত পড়েছে মিষ্টি
ঝরে না আর বিষ্টি;
নানান রঙের মরশুমীফুল—
নেয় যে কেড়ে দৃষ্টি।

আকাশটা নীল বড়
ছড়িয়ে গেছে আরো;
ঝলমলে রোদ, ঝকঝকে দিন
সবার লাগে ভালো।

পুতুল শিল্পের ইতিকথা

অনুপম মিত্র

কাগজ থেকে নানান পুতুল, নানান শিল্প সম্ভব এ যুগে, একথা কেউ অস্বীকার করবে না। কাগজ শুধু ব্যবহারিক বস্তু হিসেবেই মানুষের কাছে পরিচিত বহু কাল ধরেই। এই কাগজে বই ছাপা হয়, কাগজে আমি লিখি, আঁকি আরো কতো কি না করে থাকি। তেমনি এ থেকে হচ্ছে পুতুল নাচের পুতুল, নানান মনোরম খেলনা।। গাছ, বাড়ি, মন্দির মুখোস, নানান হাতের পশু আর পাখি। কাগজের শিল্পপ্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে এমনকি বিদেশেও রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের তৈরী সেসব পুতুল পাখীর শিল্পগুলি আজ মানুষের মন প্রাণ দখল করে নিয়েছে। এসব শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কাগজের কথা এসে যায়। আর আসবেই বা কেন, কাগজ থেকেই তো এসব পুতুল, পাখী ইত্যাদি শিল্পের প্রসার। বহু বছর আগে টোকিওতে ম্যাটসুটেরেডা নামে এক ব্যক্তি জাপানে নাকি এই কাগজশিল্পের প্রথম আবিষ্কারক। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা বহু পরিশ্রম, বুদ্ধি খরচ করে এই শিল্পকে অবশেষে সারা পৃথিবীর দরবারে এক অসাধারণ শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন ম্যাটসু টেরেডা। সবচাইতে বড় কথা হল ম্যাটসুটেরেডার চিন্তার ধারার মধ্যে গ্রীক পুরাণের গল্প পরিস্ফুট হয়েছে।

জাপানে পৌরাণিক উপন্যাস অবলম্বনে ভগবানের মূর্তিটি ম্যাটসুরেডাই তৈরী করেন। আর এটাই নাকি তার সব চাইতে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলে বিবেচিত হয়েছিল। মানুষ একটু বুদ্ধি খরচ করলেই কিনা করতে পারে। সামান্য এই কাগজের খণ্ড থেকেই তৈরী হয় নাইটিঙ্গেল, ফিঙ্গে, চড়াই, টিয়া কাকাতুয়া, ময়না, মুনিয়া খরগোশ, নেকড়ে, চিতা, কুমির, গরু, ঘোড়া, হরিণ আর নানান মুখোস। রীতিমতো উল্লেখযোগ্য শিল্প গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে প্রতিষ্ঠান। আজকাল এই শিল্প গড়ে উঠে প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন লাভ করছে তেমনি সুনাম অর্জন করছে।

জাপান এই শিল্পসামগ্রীর সুন্দর উপহার অনেক আগে থেকেই দিয়ে আসছে। এজন্যেই তো জাপানকে বলা হয় পুতুলের দেশ—খেলনার দেশ।

দেখা যাচ্ছে কাগজের কোন অংশই ফেলে দেবার নয়। কারণ শিল্পী তার চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি আর দূরদৃষ্টি দিয়ে এই কাগজের ভেতরেই নতুন এক সৃষ্টির সন্ধান খুঁজে পায়। এই কাগজ দিয়েই তৈরী হচ্ছে মূর্তি, পাখি, গাছ, মুকুট, নৌকা, বাড়ী-ঘর, পোষাক-পরা পুতুল, যুদ্ধের সাজসজ্জা-পরা পুতুল, রাজা, রাণী, কতো রকমের পুতুল।

১৯৭২ সালে নিউইয়র্কে আয়োজিত একটি শিল্প প্রদর্শনীতে এই সব শিল্পে জাপান আমেরিকাকে কোণ ঠাসা করে দিয়ে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছিল। জাপান পৃথিবীর আর অন্যান্য দেশের এই শিল্প-কর্মের দিক থেকে আসন পাকা করে নিয়েছে।

এরকম এক নজীর পরিলক্ষিত হয় প্রায় সাড়ে তিনশত বছর আগে পোলাণ্ডে। তবে এইসব শিল্পকর্ম চ্যাপটা আর বৃত্তাকার ধাঁচের।

হালুম বুড়ো হায়না

অমরেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

বনের মধ্যে ঘোরে ফেরে হালুম বুড়ো হায়না,
আগের মতো জোর নাইতো, শিকার তেমন পায় না।
তাই পশুদের ডেকে বলে, "আমার কাছে আয় না।"
দৌড়ে পালায় পশুরা সব, ভয়েতে কেউ যায় না।

ভাগ্নে শেয়াল সামনে তাহার ধরল এনে আয় না,
মুখ দেখে তার মনটা খারাপ—নায় না এবং খায় না,
কিছুই করতে চায় না সে আর—হাসে না বা গায়না,
"সাবান আনো, দাগ উঠাবো," ধরেছে এই বায় না।

রাজগীর থেকে নালন্দা

প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী

বহুশ্রুত একটি নাম—'নালন্দা'। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রগুলির ভেতরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হলো অন্যতম। শুধু প্রাচীন-ই নয়, খ্যাতি আর গৌরবের দিক দিয়েও সেকালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভেতরে নালন্দা-ই হলো শ্রেষ্ঠ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বিদেশী বিদ্যার্থীদের সমাগম হতো। এঁরা আসতেন জ্ঞানলাভের জন্যে সুদূর চীন, তিব্বত, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, ব্রহ্মদেশ এমন কি তুর্কীস্থান থেকেও।

রাজগীর থেকে নালন্দার দূরত্ব হলো মাত্র আট মাইল। বক্তিয়ারপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে রাজগীর অভিমুখে রওনা হলে আগে পড়বে নালন্দা, তারপরে মাঝে মাত্র একটি স্টেশন পার হলেই রাজগীর। তা-ই অনেকেই রাজগীর যাবার পথে নালন্দা হয়ে রাজগীরে যান, আবার অনেকে এখানে না নেমে সোজা রাজগীরে গিয়ে ওঠেন। তারপরে সেখানকার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে দেখে ফেরার পথে নালন্দা হয়ে ফিরে যান বক্তিয়ারপুরে; আবার অনেকে রাজগীরে হল্ট করে বাসে বা টাঙ্গায় করে নালন্দা দেখে রাজগীরে ফিরে এসে বিশ্রাম নেন।

আমরা অবশ্যি টাঙ্গায় চেপেই রাজগীর থেকে নালন্দা গিয়েছিলাম। দু'পাশে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মাঝখান দিয়ে পাকা পিচ্-ঢালা রাস্তা, কাজেই টাঙ্গায় চেপে যেতে কোনো অসুবিধা হয় না; বরং ট্রেনে চেপে যাওয়ার চেয়ে টাঙ্গায় বা বাসে গেলেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দু'চোখ ভরে দেখা যায়,—এ দৃশ্য শুধু সুন্দর নয় নয়নাভিরামও বটে!

ইতিহাস বলে, প্রাচীন মগধের রাজধানী ছিলো রাজগৃহ, যার বর্তমান নাম হলো—রাজগীর। রাজগীর হলো বিহারের পাটনা জেলায়। এই রাজগীরের-ই আট মাইল উত্তরে বড়গাঁও, এখানেই এককালে গড়ে উঠেছিল 'নালন্দা-বিহার'। সে যুগে 'বিহার' বলতে বোঝাতো এক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর জন্যে স্বতন্ত্র এক একটি কক্ষ। পরবর্তীকালে অবশ্য অর্থের পরিবর্তন ঘটে। বিহার বলতে বোঝাতো মঠ—যেখানে কয়েকজন ভিক্ষু এক সঙ্গে বাস করতেন। তোমরা যদি বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করো তাহলে জানতে পারবে যে, এই বিহারগুলিই পরবর্তী যুগে এক একটি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়ে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

প্রাচীন যুগের ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে, বিহার গড়ে ওঠার আগে 'নালন্দা' ছিলো একটি অখ্যাত পল্লী, কিন্তু এই পল্লীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল মনোরম, বিশেষ করে পার্বত্য শোভার জন্যে পল্লীটি ছিলো অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত। প্রাচীন যুগের ইতিহাস এ কথাও বলে যে, ভগবান বুদ্ধ নাকি এই পল্লীতেই এক ধনী ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণ করে তাকে ধন্য করেছিলেন; আর এই পল্লীর-ই ধনী বণিকেরা তখনকার যুগে দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে এখানকার জমি কিনে ভগবান তথাগতকে মঠ প্রতিষ্ঠার জন্যে দান করেছিলেন। ভগবান তথাগতের শ্রীচরণস্পর্শে ধন্য এই পল্লী সে যুগের বৌদ্ধদের কাছে ছিলো এক অতি পবিত্রস্থান।

তোমরা নিশ্চয়ই বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য সারিপুত্তের নাম শুনেছো। শোনা যায়, তিনি নাকি এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, নালন্দা হচ্ছে সারিপুত্তের জন্মস্থান হিসেবেও প্রসিদ্ধ। কাজেই ভগবান তথাগত আর তাঁর প্রিয় শিষ্যদের স্মৃতিবিজড়িত নালন্দার ওপরে যে পুণ্য-লোভী বৌদ্ধদের দৃষ্টি পড়বে তাতে আর আশ্চর্যের কি থাকতে পারে। এ ছাড়া রাজাদের অনুগ্রহ লাভের ফলে এই ক্ষুদ্রায়তন নালন্দা বিহার কালক্রমে এক

মহাবিহারে পরিণত হয়ে এক বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করে। যার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিদ্যার্থীদের এখানে আগমন ঘটতে থাকে বিভিন্ন শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের প্রত্যাশায়।

এই প্রসঙ্গে এ-কথাও মনে রাখার প্রয়োজন যে, খ্রীষ্টাব্দ শুরু হবার আগে পর্যন্ত শিক্ষাজগতে নালন্দার তেমন কোনো গুরুত্ব ছিলো না। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে মহাযান বৌদ্ধ দর্শন শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে নালন্দা কিছুটা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে, তবে সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে ছিলেন। ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নালন্দা-বিহার পরিদর্শনে আসেন। তখন কিন্তু তিনি নালন্দা শিক্ষা কেন্দ্রের তেমন কিছু গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। এটা অবশ্য তাঁর-ই লেখা বিবরণী থেকে জানতে পারা যায়।

নালন্দাকে বিশ্বের সেরা শিক্ষাকেন্দ্র রূপে গড়ে তোলার পেছনে যাঁরা মুক্ত হস্তে অর্থদান করেছেন তাঁরা হলেন গুপ্তবংশীয় সম্রাটেরা। গুপ্ত সম্রাটেরা হিন্দু হলেও এই বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে নবরূপায়নে রূপায়িত করার জন্যে মুক্ত হস্তে যে অর্থ সাহায্য করেছিলেন তা তাঁদের-ই ধর্মীয় উদারতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ ষোলো বছর ভারতে ছিলেন। একথা তাঁর বিবরণী থেকেই জানা যায়, আর এ কথাও জানা যায় যে, নালান্দার রাজা বালাদিত্য-প্রতিষ্ঠিত বিহারের উত্তর-পূর্ব দিকে যে স্তূপটি আছে সেখানেই নাকি ভগবান তথাগত বসে ধর্মপ্রচার করতেন।

নালন্দার প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেই নালন্দা-বিহার শিল্প-কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকেই নালন্দার খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং সেই খ্যাতি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গৌরবের উচ্চ-শিখরে আরোহণ করে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে। গুপ্ত রাজাদের মতো পালবংশীয় রাজারাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে প্রচুর অর্থ মুক্ত হস্তে দান করেন। কাজেই একথা বলতে বাধা নেই যে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সমৃদ্ধ হয়েছে হিন্দু আর বৌদ্ধ রাজাদের যৌথ দানে।

রাজগীর থেকে আমরা যখন টাঙ্গায় চেপে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপের সামনে এসে থামলাম তখন সকাল আটটা। এখানে আমাদের প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো, কারণ সকাল ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের স্থানীয় যাদুঘর আর অন্যান্য দর্শনীয় জিনিস দেখার সুযোগ দেওয়া হয়। আমরা তাই এক ঘণ্টা সময় কাটানোর জন্যে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম, কয়েক কাপ চা আর বিস্কুট খেয়ে আর গল্প করে সময়টা কাটিয়ে দিলাম। তারপর নালন্দা দেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে দরজার সামনে গিয়ে টিকিট কেটে ভেতরে প্রবেশ করলাম। প্রধান তোরণ অতিক্রম করে ভেতরের দিকে এগিয়ে যাবার সময়েই দৃষ্টি পড়লো—প্রবেশদ্বারের দু'পাশের পাঁচিলের ওপর পাতলা পাতলা পোড়াইঁটের গাঁথা দু'পাশের মজবুত পাঁচিল দেখলেই বোঝা যায় সে যুগের শিল্পনৈপুণ্যের অপূর্ব কলাকৌশল যা আজো বিস্ময়ের সৃষ্টি করে দর্শনার্থীদের।

ভেতরে ঢুকে দেখলাম সত্যিই দেখার আছে অনেক কিছুই; আমরা একে একে শস্যভাণ্ডার, প্রার্থনাকক্ষ, ছাত্রদের বাসের ছোটো ছোটো ঘর, সে যুগের কুয়া ইত্যাদি দেখলাম। দেখলাম পুরানো ঐ সব জিনিস-গুলিকে রক্ষা করার জন্যে সরকারী প্রচেষ্টারও ত্রুটি নেই। দেখে আমার মনে হলো, প্রাচীন যুগের ঐতিহ্য-পূর্ণ নালন্দাকে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করার জন্যে যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বা হচ্ছে তা সত্যই প্রশংসার দাবি রাখে। সরকারী প্রচেষ্টায় বিভিন্ন স্থানের বিশদ বিবরণ দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরার জন্যে ছোটো ছোটো সাইনবোর্ড দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর সেগুলির ওপরে বড় বড় হরফে লিখে দেওয়া হয়েছে তাদের পরিচিতি—ঐতিহাসিক দিন আর বর্ষ-পঞ্জী; কোন্‌টি সে যুগে কি জন্য ব্যবহৃত হতো তারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই সব ভগ্নস্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে ফটো তুলতে তুলতে মনে হচ্ছিলো অনেক কথা—যা ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে অতীতের সাক্ষী হিসেবে।

এই প্রসঙ্গে বুকানন হ্যামিলটনের কথা না উল্লেখ করে পারা যায় না; কারণ তিনিই প্রথমে উনিশ শতকের প্রথম দিকে এখানে ঘুরতে এসে উঁচু উঁচু ঢিপিগুলি দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে এই সব মাটির ঢিপির নীচে নিশ্চয়ই প্রাচীন ভারতের কোনো ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান চাপা পড়ে আছে, অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে প্রাচীন ভারতের এমন ঐশ্বর্য যা খুঁড়ে বের করতে পারলে সমগ্র পৃথিবী হবে বিস্মিত! তা-ই তাঁরই ধারণার উপর ভিত্তি করে ইংরেজী ১৮৭১ সালে ব্রডলী সাহেব—তৎকালীন বিহারের সাব-ডিভিশন্যাল-অফিসার প্রায় এক হাজার শ্রমিক নিযুক্ত করে খনন-কার্য শুরু করে মাত্র দশদিনের ভেতরে আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন প্রাচীন নালন্দার বৌদ্ধ মন্দির আর স্তূপের সারি। ধীরে ধীরে মাটির বুক চিরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শুরু করলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নিদর্শন। এজন্যে আমরা শুধু হ্যামিলটন সাহেবকেই নয়—ব্রডলীকেও শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য!

নালন্দা ছিলো সে যুগের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একটি অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে শিক্ষার্থীরা বিনা ব্যয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পেতো, এমনকি আহার আর বাসস্থানের জন্যেও তাদের কোনো অর্থব্যয় করতে হতো না। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ছাড়া আই-সিংও (চীনা পরিব্রাজক) ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ছিলেন। তিনিও যখন ঘুরতে ঘুরতে নালন্দায় এসেছিলেন তখনও নালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিলো তিন হাজারেরও বেশী। হিউয়েন সাঙের সময় ছাত্রসংখ্যা ছিলো দশ হাজার, শিক্ষকের সংখ্যা ছিলো প্রায় দেড় হাজার। এখানকার শিক্ষকদের 'উপাধ্যায়' বলা হতো।

যে সব মহাজ্ঞানী আর মহাপণ্ডিত নালন্দার অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করে অমর হয়ে আছেন তাঁদের ভেতরে ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণবতী, স্থিরমতি, আর শীলভদ্র-ই হলেন অন্যতম। জ্ঞানের জগতে এঁরা হলেন এক একজন দিক্‌পাল!

ইতিহাস বলে, সাতশো বছর ধরে নালন্দা ছিলো ভারতের তথা প্রাচ্যের জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান। নালন্দা থেকে অনেক পণ্ডিত আর শ্রমণ ভারতীয় সভ্যতা আর সংস্কৃতির বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন বিদেশেও। একারণে নালন্দা শুধু মাত্র দেশ-বিদেশের বিদ্যার্থীদের-ই আকর্ষণ করে নি। অনেক পর্যটক আর বিদগ্ধজনকে আকৃষ্ট করেছে। জ্ঞানার্জনের জন্যে যাঁরা দূর দূর দেশ থেকে এসেছিলেন তাঁদের ভেতরে কোরিয়া থেকে আগত আর্যবর্মা, তিব্বতের রাজমন্ত্রী, চীনদেশের তা-তাই, ট্যাং, হিউয়েন সাঙ্, লুই-লা প্রভৃতি শ্রমণ, আর বিদেশী পরিব্রাজক আর পণ্ডিতদের মধ্যে চীনের হিউয়েন সাঙ্, ফা-হিয়েন, আই-সিং, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করার মতো। এঁরা সকলেই এসেছিলেন নালন্দায় ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ডারের সন্ধানে। এর থেকে বেশ বোঝা যায় যে, তখনকার দিনে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থান ছিলো এই নালন্দা যা আজ ভগ্নস্তূপের ভেতর থেকে মাথা উঁচু করে উঁকি মারছে—অতীতের সাক্ষী হিসেবে। আই-সিং-এর বিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিশ বছরের আগে কোনো ছাত্রকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হতো না। যদিও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার ছিলো, তবে তাদের উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করতে করতে হতো, যা ছিলো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্যে ছাত্রদের দিতে হতো যোগ্যতার পরীক্ষা যা ছিল খুবই কঠিন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন দ্বার-পণ্ডিত থাকতেন। তিনি গল্প আর কথাচ্ছলে প্রবেশপ্রার্থীদের যোগ্যতা পরীক্ষা করতেন। যে পরীক্ষায় শতকরা আশি ভাগ প্রবেশপ্রার্থীরাই অকৃতকার্য হতো। যারা কৃতকার্য হতো তারা সত্যিকারের মেধাবী আর গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হিসেবে বিবেচিত হতো। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় যে বিদ্যার্থী প্রথম হতো তাকে 'কুলপতি' আখ্যা দেওয়া হতো; কুলপতির নীচের উপাধি ছিলো 'পণ্ডিত'।

নালন্দার শিল্পকলা, স্থাপত্য আর ভাস্কর্য সেকালের পরিব্রাজকদের মুগ্ধ করেছিলো! নালন্দার প্রধান শিল্পীর নাম কি জানো? তাঁর নাম—ধীমান। ধীমান আর তাঁর ছেলে বীতপাল এক বিশেষ ধরনের শিল্পরীতির প্রবর্তক হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

নালন্দার গৌরবময় যুগ হলো খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। তবে এ জগতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তা-ই নালন্দার খ্যাতি আর ঐতিহ্য অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ক্রমশঃই ম্লান হয়ে এসে কালক্রমে তা এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। প্রত্নতত্ত্বীয় খননকার্যের ফলে সেই ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হবার পর দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচীন যুগের পরিব্রাজকেরা নালন্দা সম্বন্ধে যা যা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা সত্য!

এখানকার মিউজিয়াম বা যাদুঘরে প্রাচীন যুগের নিদর্শন দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ভারত একসময়ে যে কতোখানি সমৃদ্ধ ছিলো তা নালন্দায় এলেই বুঝতে পাববে। বুঝতে পারবে, পৃথিবীর সংস্কৃতির ভাণ্ডারে ভারতের দান সামান্য নয়—অ-সামান্য!



আমার কিশোর-কিশোরী বন্ধুর দল,

আমাদের দেশে যে শিশুর শিক্ষা কোন্ পথে চলেছে—সেকথা ভেবে কোনো কূল-কিনারা পাই না।

আমাদের ছেলেবেলায় খুব সহজভাবে শিশুর শিক্ষা শুরু হত তাতে আড়ম্বর ছিল না। প্রাচুর্য ছিল না। কিন্তু আন্তরিকতা ছিল। সাধারণতঃ মাঘ মাসে সরস্বতী পুজোর দিনই বাড়ীর নতুন ছেলের হাতে খড়ি হত। হয় পাঠশালার কোনো গুরুমশাই, না হয় সেই বাড়ীর কোনো জ্ঞানবৃদ্ধ ছেলেটিকে কোলে বসিয়ে অ-আ-ক-খ-র দাগা বুলিয়ে দিতেন। অনেক সময় মা-দিদিমা-ঠাকুমার হাতেও হাতে খড়ি হত।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে খড়ি এই রকম সহজ ভাবেই এক পণ্ডিতমশায়ের হাতে সম্পন্ন হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের হাতে খড়িও বীরসিংহ গ্রামের এক পণ্ডিত মশাই অতি সহজ ভাবেই শিশুর হাত ধরে অ-আ-ক-খ লিখিয়ে সমাধা করেছিলেন।

শোনা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এক দিনেই বর্ণমালার সমস্ত অক্ষর চিনে ফেলেছিল। শিশু ঈশ্বরচন্দ্রের মেধা আর বুদ্ধি ছেলে বয়েসেই নানাভাবে ধরা পড়েছিল। বাবার সঙ্গে কলকাতায় আসতে গিয়ে মাইলস্টোনের ইংরেজী সংখ্যা দেখে ঈশ্বর যে ইংরেজী অক্ষর চিনে ফেলেছিল—সেটা ত একেবারে গল্পকথা হয়ে আছে।

এইভাবে সেকালের মনীষীদের ছেলেবেলায় অতি সহজ ভাবেই শিশুশিক্ষা শুরু হয়েছিল। কিন্তু তাতে বাড়ীর লোকজনদের, আর বিশেষ করে শিশুর মনের আগ্রহটাই বড় কথা ছিল।

এইভাবে রামমোহন, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী, আনন্দমোহন বসু, জগদীশ বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নবীন সেন প্রভৃতি নামকরা লোকের হাতেখড়ি হয়--অতি সাধারণ ভাবে মায়ের কাছে অথবা গ্রাম্য পণ্ডিতমশায়ের হাতে। অতি সহজ ভাবে তাঁদের শিক্ষা আরম্ভ হলেও তাঁরা কিন্তু প্রত্যেকে দিকপাল পণ্ডিত ও কৃতবিদ্য শিক্ষাবিদ হতে পেরেছিলেন।

আমাদের এই যুগে দেখছি আড়ম্বরটা বেশী কিন্তু সতিকারের শিশু শিক্ষা কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছে—সেটা সত্যি ভেবে দেখবার মতো।

যাই হোক—এই মাঘ মাসের কথাই বলি।

মাঘ মাসে—বাণী বিদ্যাদায়িনী সরস্বতীর পুজো।

মূলতঃ এটা ছাত্র-ছাত্রীদের অনুষ্ঠান।

অনেক পুজোমণ্ডপে ছাত্রদল নিজেরা দেবী বীণাপানিরা প্রতিমা তৈরী করে। তাতে রঙ্ লাগায়। আজকাল বহু অঞ্চলে সব শুক্লা সরস্বতীর আরাধনা হয়ে থাকে। সেই জন্যে অধিকাংশ অঞ্চলে শুভ্র প্রতিমা নির্মাণ করা হয়। তাতে ছাত্রদের বহুগুণপণা প্রকাশ পায়।

সরস্বতী শুধু ত বিদ্যারই দেবী নন। তিনি শিল্প, সঙ্গীত নৃত্য প্রভৃতি চৌষট্টি কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

সেই জন্যে দেবী সরস্বতী পড়ুয়ামহলে, বিদ্যালয়ে, সঙ্গীতশিক্ষালয়ে, শিল্পবিদ্যালয়ে, রঙ্গালয়ে সমভাবে পুজিতা।

এই দেবী বীণাপাণির আরাধনা-কালে—আমাদের দেশে ছাত্রদল—চিত্রপ্রদর্শনীরও আয়োজন করে থাকে। নিজেরা মঞ্চ নির্মাণ করে অভিনয়ের আয়োজন করে, প্রতিমাকে নব রূপ দানের জন্য পাহাড়, হ্রদ, ঝরণা প্রভৃতি তৈরী করে শিল্পকলার পরিচয় প্রদান করে।

এই সরস্বতী পুজোয় গ্রামাঞ্চলে যাত্রাগান প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। তাতে হাজার হাজার ছাত্র ও ভক্তবৃন্দ যোগদান করে থাকে।

সরস্বতী পুজোয় প্রসাদ বিতরণ একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব।

ছাত্রদল—কলাগাছ এনে, দেবদারু পাতা সাজিয়ে পুজোমণ্ডপ শোভন ও সুন্দর ভাবে সজ্জিত করে। যে সব ফল তারা সংগ্রহ করতে পারে—তা প্রতিমার সম্মুখে সাজিয়ে দেয়। দোয়াতের কালি ফেলে দুধ ভর্তী করে, তার সঙ্গে খাগের কলম এগিয়ে দেয়। ছাত্রদল নিজের হাতে খিচুড়ি রন্ধন করে—কলাপাতা পেতে সবাইকে সারে সারে বসিয়ে প্রসাদ পরিবেশন করে।

এ যুগে কিন্তু সরস্বতী পুজোর আড়ম্বরটা বেশী হচ্ছে—প্যাণ্ডেল নির্মাণ হচ্ছে, মাইকে হিন্দি গান বাজছে, সাজপোশাকের জৌলুষ দেখা যাচ্ছে,—চাঁদা আদায়ের অত্যাচার চলছে। কিন্তু সে তুলনায় ছাত্র-দলের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা কমে যাচ্ছে।

এটা আমাদেরই পুজো—এই মনোভাবটা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

আবার দেখা যাচ্ছে,—ছেলেমহলে খেলাধুলোর চর্চাটা বেড়ে চলেছে। ক্রিকেট, ফুটবল, নানাজাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমভাবেই এগিয়ে চলেছে। আমাদের জাতীয় জীবনে এই খেলাধুলার চর্চাকে সুলক্ষণ বলেই আমরা স্বাগত জানাবো।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েরা যখন খেলাধুলায় ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে—তখন ভারতের ছেলেমেয়েদের শরীরচর্চায় পেছিয়ে থাকলে চলবে কেন ?

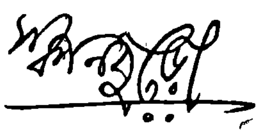
তবে দুঃখের কথা, আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে পারি না। তাই দেশ ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে।

কিছু কিছু শিশুকল্যাণের কাজ যে আমাদের দেশে হচ্ছে না, তা নয়। তবে আমাদের বিরাট ভারতবর্ষের তুলনায় তা' একান্ত নগণ্য।

তবু আমরা আশাবাদী। কিছুতেই হতাশ হয়ে পড়ি না। মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করি—

" ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

কাছের আর দূরের বন্ধুদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে মাঘ মাসের চিঠিতে ইতি টেনে দিচ্ছি—



তোমাদের চিঠির উত্তর

ত্রিদিব গুহ, শিবেন্দ্র গুহ (মাথাভাঙা, কোচবিহার)

তোমরা ঝলমল পড়ো, আর চিঠির উত্তর তোমাদের ভালো লাগে জেনে আনন্দিত হলাম। তোমরা এই কাগজে ধাঁধা ও ম্যাজিক চাও। মাঝে মাঝে তো দেওয়া হয়। অনেক মজার ছড়াও ত' পড়তে পারো।

ছড়া, ছবি, গল্প
আছে হাসি খেলা ত'
এই সব পড়তেই
কেটে যায় বেলা গো।

রাখাল চন্দ্র দেবনাথ (গুড়িয়াহাটি, কোচবিহার)

পুজো সংখ্যা ঝলমলে তোমার একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে জেনে আনন্দিত হলাম। আমরা কিন্তু ছেলেবেলায় এমন কবিতা লিখতে পারতাম না। তুমি আবার অভিনয়ও করতে পারো। তা হলে দেখছি তোমার অনেক গুণ।

তোমাদের নানা গুণে
খুশী আমি ভাই—
তাই আমি ছড়া কেটে
তব গুণ গাই॥

প্রিয়দর্শী (বোলপুর)

তুমি লেখকদের আত্মজীবনী সংগ্রহ করছো। কাজট প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তোমায় অনেক পরিশ্রম করতে হবে। তুমি কবিতাও লেখো জেনে আনন্দিত হলাম। এখন অনুশীলন করে যাও—নিশ্চয়ই জয়-যুক্ত হবে।

সাহিত্যপথে জেনো
আছে বহু কাঁটা গো—
ভয় পেয়ে কাজে যেন
পড়ে নাকো ভাঁটা গো।

সুতপা ঘোষ (বালুর ঘাট)

তোমাদের হাতে লেখা পত্রিকায় লেখা দিতে বলেছ।

আমার মনে হয়—নিজেদের রচনা দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করাই ভালো। তাতে তোমাদের সাহিত্যচর্চাও হবে, আর লেখবার একটা প্রেরণা জাগবে।

নিজেদের লেখা দিয়ে
সাজাও না কাগজে—
ছড়া, ছবি, গল্প
রচিবারে লাগো হে !

বিশ্বনাথ শীল (চন্দননগর)

সম্পাদকের ঠিকানা তো কাগজেই ছাপা থাকে। ভালো করে দেখে নাও। সেই ঠিকানাতেই লেখা পাঠানো উচিত। লেখা যদি মনোনীত হয়—তবে সম্পাদক মশাই নিশ্চয়ই তা ছাপবেন। সম্পাদকও ত' ভালো লেখার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকেন।

ভালো লেখা হলে পরে
ছাপা হয় ঠিক—
ছন্দপতন হলে—
সকলই বেঠিক।

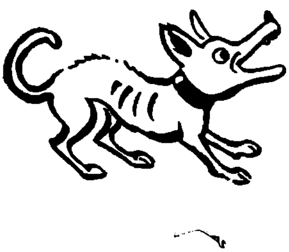
কল্যাণকুমার গাঙ্গুলী ও প্রদীপকুমার গাঙ্গুলী (রাণাঘাট)

তোমরা রাণাঘাটের ছেলে। তোমরা শুভেচ্ছা চেয়ে পাঠিয়েছ।

তোমাদের সৌরভে
ভরে যাক ধরা
তোমরা মানুষ হলে
দেশ হবে গড়া ॥

অরিন্দম চক্রবর্তী (ঠাকুরপুকুর)

তুমি মন দিয়ে পড়াশুনা কর জেনে খুশী হলাম। বাবার কথা শোন, মাকে মেনে চল। স্কুলে গিয়ে কোন গোলমাল কর নাক। বড় মাসী, ঠাকুরমার কথামতো চল।—শুনে খুব আনন্দ পেলাম।



পাখি থেকে হাতী

আশাপূর্ণা দেবী



(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জিরে যে জিনিসটাকে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে অবাক হলো, সে জিনিসটা কিন্তু নেহাৎই তুচ্ছ আর সর্বদাই দেখা জিনিস। আর কিছু নয়, একখানা ছোট সরু চিরুণী। লাল রং, সরু লম্বাটে গড়ন, প্রায় সব ছেলেরই প্যাণ্টের পকেটে যেমন দেখতে পাওয়া যায়। যখন তখন চুল আঁচড়ানো তো এখনকার ছেলেদের একটা ফ্যাসান।

কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে তেমন ছেলে কোথা থেকে এল? আর এলই যদি। চিরুণীটা ফেলে দিয়ে গেল কেন? সেও কি জিরের মত রাস্তা হারিয়ে, দলের লোক হারিয়ে অস্থির হয়ে বেড়িয়েছে? তবে বেশী দিন পড়ে আছে বলেও মনে হচ্ছে না, ধুলো বালি লেগে নেই কিছু। যেন আজ কি কাল থেকে পড়ে আছে। চিরুণীটার কয়েকটা দাঁড়া ভাঙা। তার মানে বাতিল বলে ফেলে-দেওয়া।

তবে কি সামনের দিকে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়বার কোনো সহজ পথ আছে? যেখান দিয়ে চিরুণী পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার মত লোক আসতে টাসতে পারে? জিরের মনে একটু আশার সঞ্চার হলো।

যদিও উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম বলে কিছুই জিরের পক্ষে বোঝবার উপায় নেই। আর বোঝবার বুদ্ধিও নেই জিরের। তবু কোন একটা দিককে 'সামনে' তো ভাবতেই হবে। একটু ইতস্ততঃ করে চিরুণীটা কুড়িয়েই নিল জিরে।

যদি নাড়ুমামার সঙ্গে বা টুংরির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, দেখানো যাবে।

জিরে একটা দিকে জঙ্গলে অবস্থা একটু হাল্কা দেখে, সেই দিকেই এগোতে গেল, আর তখনই দেখতে পেল আবছা মত যেন একটা পায়ে চলা পথ। জিরের

প্রাণের মধ্যেকার আশাটা আরো জোরালো হলো। আছে আছে. রাস্তা আছে। মানুষের যাওয়া আসা আছে। মনে হচ্ছে নাড়ুমামার মতো এক আধদিন শিকারে আসা লোক নয়। মাঝে মাঝেই আসে যায়। না হলে পায়ে চলা পথটা হবে কী করে ?

জন্তু জানোয়ারের হাঁটা চলার রেখা ?

হনুমানের ? বনমানুষের ?

কিন্তু বনমানুষ কি চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ায় ? ভাবতে ভাবতে, সেই আবছা রেখা ধরে আর একটু এগোতেই জিরে হঠাৎ যা দেখতে পেল, তা দেখে আর ওর অবাক টবাক নয়। স্রেফ হাঁ হয়ে গেল।···হাল্কা হয়ে আসা বনের মধ্যে এক গাদা ভাঙা চোরা ছোট ছোট ইঁট ছড়ানো। তাদের গায়ে দীর্ঘকালের শ্যাওলা ধরা। জিরের মনে হলো নিশ্চয় কোনো কিছু ছিল এখানে, বাড়ি কি পাঁচীল টাঁচিল। কোনো কালে ভেঙে পড়ে গেছে।

কিন্তু এই বনের মধ্যে বাড়ি ?

জিরের গল্পের বই গেলা মগজ অন্য একটা কথা উদয় হলো। বাড়ি নয়, নিশ্চয় মন্দির। নির্ঘাৎ কোনো কালে 'ডাকাতে কালীর' মন্দির টন্দির কিছু ছিল। সেকালে ডাকাতরাই এ রকম বনজঙ্গলের মধ্যে কালী মন্দির বানাতো।

কিন্তু এ আর এমন কী? এতে হাঁ হয়ে যাবার কী আছে ? পুরণো বাড়ি টাড়ি কি মন্দির টন্দির ভেঙে পড়ে গেলে, অনেক অনেক বছরে তো গাছ গজিয়ে স্তূপ হয়ে যেতেও পারে, এ সব জিরে জানে। পড়ার বই, গল্পের বই, আর কালিংপঙের দাদু, এই তিন জায়গা থেকে জিরের জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে উঠেছে।

কাজেই জঙ্গলের মধ্যে কিছু ভাঙাচোরা শ্যাওলা ধরা ইঁট ছড়ানো দেখে বিশাল সাইজের একটা হাঁ করে ফেলবার কারণ ছিল না কিছু।

হাঁ হয়ে গেল অন্য একটা দৃশ্য দেখে। অথচ সেও একদম রোজ রোজ দেখা দৃশ্য। জিরেদের কলকাতার বাড়ির বারান্দায় এ দৃশ্য তো সর্বদাই দেখে।

মা তো বাবাকে রোজ বলে, ছাদ থাকতে তুমি ভিজে প্যান্টগুলো বারান্দায় শুকোতে দাও কেন ? কিন্তু বাবার ওই অভ্যাস। বারান্দার সামনে একটা দড়ি টাঙিয়ে ভিজে প্যান্ট ঝুলিয়ে দেবে। আদরের টেরিকট প্যান্টগুলো নিজের হাতে কাচা চাই তো।

তা' সে তো আলাদা কথা। তাই বলে এই জঙ্গলের মধ্যে গাছের ডালে বাঁধা দড়িতে সারি সারি তিনটে ভিজে প্যান্ট ঝোলানো থাকবে রঙিন প্লাস্টিকের হ্যাঙ্গারে আটকানো ? এ দৃশ্য কী সোজা ? এই মাত্রই কেউ ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, এখনও প্যাণ্টেদের ঝুলন্ত পাগুলো থেকে টুপটাপ জল পড়ছে। ঠিক যেমন বাবার প্যাণ্টে ঝরে।

জিরের আহ্লাদও হলো, আবার ভয়ও হলো।

আহ্লাদ এই ভেবে যে, এখানে ভালো ভালো প্যান্ট পরার মতো লোক বাস করে। আবার ভয় হলো কেন বাস করে ভেবে। বনের মধ্যে বাস করতে আসবে কেন ভদ্রলোকে ? আর যদি বাসই না করবে তো, কাচা প্যান্ট শুকোতে দিতে আসবে কেন ?

বনের মধ্যে যদি গাছের ডালে বাঁধা দড়িতে জিরে কোনো গেরুয়া কাপড় টাপড় শুকোচ্ছে দেখতো, অবাক হবার কিছু ছিল না। মনে হতো, কোনো সাধু সন্নিসী এখানে বাস করেন তপস্যা করতে। তা এতো আর সাধুর গেরুয়া নয় ? স্রেফ গেরস্থ লোকের ব্যাপার। শৌখিন ভদ্রলোকের ব্যাপার।

ভয় করলেও জিরে আস্তে আস্তে এগিয়ে এগিয়ে প্যান্টগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ইচ্ছে হোল একটু ছুঁয়ে দেখে, সাহস হল না। যদি সেই—'সাত বামনের দেশ' এর মত কিছু হয়। ভেবেই এত কষ্টের মধ্যেও হেসে ফেলল জিরে। বামন, বা কি এতো লম্বা লম্বা প্যান্ট পরে ?

হেসে ফেলার পরই জিরে হঠাৎ যেন ভুলে যায় সে কোথায় আছে. কী করছে। তাই আরো এগিয়ে যায় ভাঙা ইঁট পাটকেল ডিঙোতে ডিঙোতে, আর সেই সময় জিরে আচমকা কেসে ফেলে। কাসতেই পারে। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি জল পর্যন্ত না। আর এতো হাঁটা। গলা শুকিয়ে কাঠ। সেই শুকনো গলার কাঠ কাসি।

হায় কে জানতো ওই 'কাঠ কাসির' দায়ে সঙ্গে সঙ্গে তার জন্যে এগিয়ে আসবে 'ফাঁসি কাঠ'।

যেই কেসে ফেলেছে, সেই কোথা থেকে যেন একটা অদৃশ্য গলার কড়া চীৎকার ভেসে এলো, 'কে রে?'

সেই ভোর থেকে বনের পথে পথ হারিয়ে ফেলে বেচারা জিরে যদি বা একটা মানুষের সাড়া পেল, তো সে সাড়া 'তাড়া' দেওয়া তুল্য।

শব্দটা কোন্ দিক থেকে আসছে ভেবে জিরে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে. হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে একজন সামনে এসে দাঁড়াল। দেখে—জিরে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার জোগাড়। কিন্তু লোকটা কি ভয়ঙ্কর একটা ডাকাত টাকাত মত? মোটেই না।

দিব্যি পরিষ্কার চেহারার একটি বাইশ চব্বিশ বছরের ছেলে, পরনে সাদা পায়জামা, আর স্যান্ডো গেঞ্জি। পায়ে হাওয়াই চটি। কিন্তু হাতে? হ্যাঁ হাতেই এক ভয়ঙ্কর বস্তু, যা দেখে জিরে আঁৎকে উঠে থর থর করে কাঁপতে লেগেছে। ছেলেটার ডান হাতে একটা ঝকঝকে ধারালো ছুরি, আর বাঁহাতে একটা অর্ধেক ছাল ছাড়ানো মুরগী। মুরগীটার গলাটাকে বাগিয়ে চেপে ধরে বোধহয় ছাল ছাড়াচ্ছিল, সাড়া পেয়ে সোজা উঠে এসেছে।

ওর দু'হাতে যদি ওই বীভৎস জিনিস দুটো না থাকতো, জিরে বোধ হয়, 'দাদা' কি 'মামা' বলে ডাকতেও পারতো, এমন পরিপাটি চেহারা। কিন্তু চেহারায় কী হয়? সে তো, ভগবানের দেওয়া ভগবানের সেই দানের 'মান' রাখতে ক'জন পারে?

ছেলেটা কড়া চোখে তাকিয়ে কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'কে? কে তুই? এখানে এলি কোথা থেকে?'

কথা বলছে হাতের ছুরিটা উঁচিয়ে।

জিরে কি আর জবাব দিতে পারে? পাথরের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে। যদিও—তার ইচ্ছে হচ্ছিল বসে পড়ে।

ছুরিটা নাচাতে নাচাতে একেবারে জিরের কাছাকাছি এসে পড়ে ছেলেটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে, 'জবাব দিচ্ছিস না যে? এখানে এলি কী করে?'

জিরে বলতে চেষ্টা করে, 'রাস্তা হারিয়ে' কিন্তু জিরের গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না। তবে ততক্ষণে অন্য একজনের গলার শব্দ শোনা যায় সেও অদৃশ্য লোক থেকে। 'কী রে গুরু? কী হল? শেয়াল তাড়াচ্ছিস?'

বলতে বলতে দু'নম্বরও চলে এল।

আর জিরে অবাক হয়ে দেখল, ডান দিকে একটা ভাঙা ভাঙা পাঁচীলের ওধারে দেখা যাচ্ছে দিব্যি খোলা-মেলা একটা পাথর বাঁধানো মস্ত চাতাল।

'চাতাল' কথাটা এবারই দাদুর বাড়ি এসে শিখেছে জিরে। দিদার রান্নাবাড়ির পিছনে অনেকটা সীমেণ্ট বাঁধানো জায়গা আছে, সেখানে গাদা গাদা ছোলা মটর এই সব রোদে দেওয়া হয় ছড়িয়ে ছড়িয়ে। দিদা বলেন, চাতালে সব ছিষ্টি রোদে দেওয়া হয়েছে, হনুমান এলেই গেছি বাবা।

জিরে অনুভব করে,-ইট পাটকেল দেখে যা ভেবে ছিল, তাই। বনের মধ্যে মন্দির কি বাড়ি একটা ছিল, ভেঙে পড়ে গেছে। এদের বোধহয় সারাবার পয়সা টাকা নেই। কিম্বা এরা বোধহয় উদবাস্তু, এই ভাঙা বাড়ির মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে। যেমন জিরের ননী পিসিমার গোলপার্কের বাড়ির কাছে দেখেছে। বিরাট একটা রাজবাড়ির মত ভাঙা পচা বাড়ির মধ্যে গাদা গাদা উদবাস্তু এসে বাস করছে।

কিন্তু সে তো গোলপার্ক। গড়িয়াহাটের বাজার টাজার আছে। এখানে এরা কী করে থাকে? কী খায়? শুধু বনের মুরগী ধরে ধরে কেটে কুটে? এক মিনিটের মধ্যেই এতো কথা ভাবা হয়ে গেল জিরের, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না।

দ্বিতীয় ছেলেটাও ওই একই ধরনের। শুধু পরনে পায়জামা নয়। একটা ছাপ ছাপ লুঙ্গি।

এসেই একটা শীস দিয়ে বলে ওঠে। আরে সাবাস। এটি আবার কোন্ গগন থেকে খশে পড়ল? 'কোন্ কাননের ফুল তুমি হে? কোন্ গগনের তারা?' ও গুরু? এর মানে?

মানে বোঝ্ তুই!

দুনম্বরও জিরের কাছাকাছি সরে এসে বলে, এতো বাবা লোক্যাল মাল নয়। এ যে দেখছি শহরে বড়-লোকের লালটু ছেলে! কোমরের বেল্টখানা দেখেছিস? মার-কাটারি! তো কোথা থেকে উদয় হলো রে গুরু?

সেই তো চিন্তা। জিগ্যেস করছি, জবাব দিচ্ছে না।

বোবা কালা নয়তো ?

দু' নম্বরের এই কথাটা শুনে এক নম্বর বিচ্ছিরী মত হেসে বলে, ওর চোদ্দ-পুরুষ বোবা নয়। এই যে এখখুনি বোল ফোটাতে পারি।

বলেই বাঁহাতে ধরা মুরগীটাকে উঁচু করে তুলে ধরে ডান হাতে ছুরিটা নাচাতে নাচাতে বলে, বেশী চালাকি করতে আসিসতো স্রেফ্—এই রকম। বুঝতে পারছিস ?

বলেই আচমকা একটা ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, বদমাস, শুয়োর! বল্ কোথা থেকে এসেছিস!

বদমাস! শুয়োর!

ধমকের দাপটে জিরে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

কিন্তু, কেঁপে উঠল কি ভয়ে ?

মোটেই না।

জিরে কেঁপে উঠল রাগে।

বদমাস! শুয়োর!

জিরেকে বললো একথা! এতো সাহস! জিরে কি রাস্তার ছেলে? তাই যা ইচ্ছে বলতে এসেছে! আর শুধু শুধু রাস্তার ছেলেকেই বা খারাপ কথা বলবে কেন? ভেবেছে কী এরা!

রাগের চোটে ভয় টয় সব লোপাট হয়ে গেল। জিরে আগুন জ্বলা চোখে বলে উঠল, শুধু শুধু খারাপ কথা বলছেন কেন? কে আপনারা? এতো অসভ্য!

জিরের গলাটা ধারালো। আর যতটা পেরেছে জোরে চেঁচিয়েছে। সেই চেঁচানির ফলে আরও একজন ভিতর থেকে চলে এল। ও বাবা! জিরে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

তিনটে প্যান্টের মালিক তিনজন ?

না কি এই ভাঙা ইঁটের আড়ালে আরো অনেক লোক আছে ?

এ ও প্রায় ওই বয়েসেরই, হয়তো কিছুটা বড়। এরও পরনে লুঙ্গি। এর হাতে একটা বড় মত গোটানো কাগজ। এ ও এসেই দাঁড়িয়ে পড়ে অবাক গলায় বলে ওঠে এই ছেলেটাই চেঁচালো বুঝি? কে এ?

এক নম্বর বলল, সেই তো প্রশ্ন। বলছে না।

তিন নম্বর একটু স্থিরভাবে বলে, এতোটুকু ছেলে একা এখানে এসে হাজির হল কী করে ?

দু'নম্বর বলল, সন্দেহ হচ্ছে পেছনে লোক আছে। আমার তো মনে হচ্ছে খতম করে দেওয়াই ভাল। গুরুদেব! ছোরাটা আর মিথ্যে নাচিয়ে কী হবে? গিঁথে দিলেই তো হয়।

তিন নম্বর তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, এই খবরদার। তাহলে তো রহস্যভেদই হবে না। এই খোকা, তুমি এখানে এসেছো কেন বলতো ?

জিরের মনে হলো, এ লোকটা তবু ভদ্র। 'তুমি' বলে কথা বলতে জানে। বদমাস শুয়োর এই সব না বলে, 'খোকা' বলছে।

জিরে বেশ আত্মস্থ গলায় বলে ওঠে, কেন আবার? রাস্তা হারিয়ে ফেলে ঘুরতে ঘুরতে! এও বুঝতে পারছেন না ?

রাস্তা হারিয়ে! তা' এই বনের মধ্যে আসার দরকারটা কী পড়েছিল বাপ ?

জিরে বুক জোর করে উত্তর দেয়, বনের মধ্যে মানুষ কী জন্যে আসে জানেন না? শিকার করতে!

শিকার! হা হা হা! তুমি!

শিকার! হো হো হো! তুই?

শিকার! হি হি হি! তুই?

তিন জনেই এক সঙ্গে হেসে ওঠে।

শিকার করতে এসেছো যাদু? তো কী শিকার করতে? বাঘ? শুধু হাতে? আচ্ছা বীর পুরুষ তো? তা' কটা বাঘ মারলে?

জিরে গম্ভীর ভাবে বলে, বোকার মত কথা বলছেন কেন? আমি আবার কি শিকার করব? শিকার তো আমার—

কথা শেষ করার আগেই এক নম্বর ছুরির বাঁটটা দিয়ে মাথায় দু ঘা বসিয়ে দেয় জিরের।

কী বললি উল্লুক? বোকার মত কথা বলছি কেন? বড্ড সাহস দেখছি যে। এই তপাদা, আর সহ্য হচ্ছে না। দিচ্ছি ছোরাটা পেটে ঢুকিয়ে—

তিন নম্বর বিরক্ত হয়ে বলল, আঃ! যীশু কী হচ্ছে? ঘটনাটা জেনে নে আগে।

ওঃ। ছুরি হাতে লোকটার নাম যীশু। আহা রে!

এতো দুরবস্থার মধ্যেও জিরের হঠাৎ খুব হাসি পেয়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই 'খি খি' 'হি হি' করে হেসে উঠে বলে এনার নাম যীশু! আহা! নামের কী মান্য! যীশু কী বলেছিলেন? বলেন নি, যে, যদি কেউ তোমার এক গালে চড় মারে তা তুমি তাহার দিকে অপর গালটি বাড়াইয়া দেবে। আর ইনি যীশু মশাই?

শুধু শুধুই ছুরি নিয়ে মারতে আসছেন।

কথাটা শুনে দু নম্বর আর তিন নম্বর দু'জনেই হেসে ওঠে। কিন্তু এক নম্বর, অর্থাৎ যীশু হাসে না। সে মুখখানা প্যাঁচা করে বলে, হুঁ। খুব জ্ঞানের বুলি ঝাড়া হচ্ছে দেখছি।…বেশী ফুটানি করতে আসিস তো কপালে তোর দুঃখ আছে ভাল চাসতো সত্যি করে বল, কী মতলবে এসেছিস? কে আছে সঙ্গে?

লোকটাকে জিরের এতো খারাপ লাগছে যে জিরে রাগ চাপতে পারছে না। ভয় ভাবনা দূরে ফেলে জোর জোর গলায় বলে, মতলব মানে? আমি কি চোর না কি? তাই মতলব করে এসেছি? বললাম না মামার সঙ্গে শিকারে এসে, রাস্তা হারিয়ে ফেলে মামাকে খুঁজে পাচ্ছি না।

বটে! বটে! মামা। কই মামার কথা তো বলিস নি এতোক্ষণ?

বলতেই তো যাচ্ছিলাম—

জিরে বুক টান করে বলে ওঠে, আপনি বলতে দিলেন? ছুরি মেরে, মেরে ফেলবার জন্যেই তো ব্যস্ত।

না, ব্যস্ত হবো না, রসগোল্লা খাওয়াবো। মামার নাম কী?

জিরের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

মামার নাম। সেরেছে! নাড়ুমামা বলেই তো জানে জিরে। ওর যে আবার একটা নাম থাকতে পারে, আর সেটা হঠাৎ কোনো সময় দরকার হতে পারে, এটা কোনদিন ভাবে নি জিরে।

কিন্তু হারলে তো চলবে না।

জিরে তাই গম্ভীর ভাবে বলে, নাড়ুমামা।

অ্যাঁ। কী বললি? নাড়ুমামা? সাবাস! হাতে পেলেই—সেঁটে ফেলার মত তো ওই নামটি ছাড়া আর নাম নেই সে ব্যাটার?

ব্যাটা মানে?

জিরের মাথা গরম হয়ে ওঠে।

একেই খিদের জ্বালায় মাথা ঝিম ঝিম করছে তার ওপর বিশ্রী কথা। জিরে আর চেঁচায় না।…গম্ভীর ভাবে বলে, একটু ভদ্রভাবে কথা বলতেও জানেন না? ছিঃ।

যীশু বলে, তপাদা, তোমার খাতিরে এতোটা সইছি! কিন্তু আরতো—

তপাদা বলে, আরে বাবা ওই দুগ্ধপোষ্য শিশুটা কি তোর রাগের যোগ্য?

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র নাথ মল্লিক।

ও বাবা। কী পেল্লায় নাম। থাকো কোথায়?

কলকাতায়। আবার কোথায়।

কলকাতা থেকে এই শালতোড়ের জঙ্গলে এসেছো শিকার করতে?

আহা। কলকাতার রাড়িতে যেন নাড়ুমামা থাকে। এখন তো আমি মামার ভেকেশানে শালতোড়ায় দাদুর বাড়িতে এসেছি।

জিরে একসঙ্গে আরো বলে যায়, শালতোড় আর এই সব জঙ্গল টঙ্গল সবতো আমার দাদুর দাদুদের ছিল। ওদের তো তখন সবাই রাজা বলতে। আর এখন—

জিরেব কথা শেষ হতে পায় না। যীশু আর দু' নম্বর একসঙ্গে বলে ওঠে, কী বললি? শালতোড়ের রাজা ছিল তোর দাদুর দাদু?

ছিলই তো। কে না জানে?

হঠাৎ গুম হয়ে যায় এরা। তারপর নিজেরা কী যেন ইসারা করে।

তারপরই যীশু বাঘের মত লাফিয়ে ওঠে, তপাদা দেখছিস? ইনোসেন্ট সেজে এসে আচ্ছা ঠিক আছে। চলতো মানিক, তোমার বাবার মত আদর করে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাবার খাওয়াইগে ভালো খাবার। সেরা খাবার। 'ছেনো' ঘাড় ধরে নিয়ে চলতে ছোঁড়াকে। এই বদমাস! ট্যান্ডাই ম্যান্ডাই করতে আসিস তো দেখছিস? এই—'

বলে ছুরিটা উঁচোয়।

দ্বিতীয় লোকটা, যার নাম নাকি 'ছেনো'। সে জিরেকে সত্যিই ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে—ওই চাতালটা পার হয়ে একটা সিঁড়ির তলা মত ঘরে ঠাঁই করে ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয় বাইরে থেকে।

জিরের আর জ্ঞান থাকে না।

(চলবে)



অন্ধকারে সবুজ আলো

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সকলেই এমন অবাক হয়ে গিয়েছিল যে বেশ কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না।

তারপর স্বপন আর রামুকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হলো পাশের ঘরে। বিমান উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞেস করলো, ওদের এক্ষুনি আবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়?

ডক্টর মৌলিক বললেন, না, তার দরকার হবে না। কাল থেকে আমি তো ওদের অবজার্ভ করেছি। শুধু অজ্ঞান হয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো কমপ্লিকেশান নেই।

চক্রধারী বাবু ধপ্ করে বসে পড়ে বললেন, কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! ছেলে দুটোর মৃগী রোগ আছে নাকি? ঘরে ঢুকেই অজ্ঞান হয়ে গেল? আর আমার দিকেই বা অমন করে ছুটে এলো কেন?

প্রিয়ব্রত বললো, মানে হচ্ছে ওরা আপনাকে চিনতে পেরেছে!

চক্রধারীবাবু চোখদুটো প্রায় কপালে তুলে বললেন, আমাকে? ওরা আমাকে চিনবে কী করে? আমি তো ওদের জন্মে কখনো দেখি নি!

—তা হলে ওরা আপনার দিকে ছুটে এলো কেন? অচেনা লোকের দিকে কেউ অমন ভাবে ছুটে আসে?

আমিও তো সেই কথাই জিজ্ঞেস করছি!

আপনি ও ঘুমের সবুজ আলো বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, ওরা ও সবুজ আলো, সবুজ আলো চিৎকার করেই অজ্ঞান হয়ে গেল। এই দিক থেকেও আপনার সঙ্গে ওদের মিল আছে।

—এই সবুজ আলোর ব্যাপারটাই তো আমি বুঝতে পারছি না মশাই। সবুজ রঙের আলো হয়?

—কেন হবে না। সব রঙেরই আলো হয়। চক্রধারীবাবু, আপনি খুব ভালো করে মনে করে দেখুন তো. আপনি যে মাঝ রাস্তায় ট্রাক থামিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তারপর চোখে একবার তীব্র আলো পড়ায় জেগে উঠেছিলেন, সেই আলোর রং সবুজ ছিল?

—আপনি যখন বলছেন, হতেও পারে।

—হতেও পারে টারে কি না জানতে চাইছি না, জানতে চাই সেটা সত্যিকারের সবুজ আলো ছিল কি না!

—সেটা যে আমার ভালো মনে নেই। অনেকটা যেন স্বপ্নের মতন...

ডক্তর মৌলিক পাশের ঘর থেকে ফিরে এসে বললেন, ওদের দু'জনেরই চোখের পাতা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। খুব সম্ভবত তাড়াতাড়িই জ্ঞান ফিরে আসবে, তারপর কী হবে ?

বিমান বলল, ওরা জেগে উঠে যদি চক্রধারী বাবুকে দেখে আবার অজ্ঞান হয়ে যায় ?

প্রিয়ব্রত বললো, না, না, সে ঝুঁকি নেওয়া আর ঠিক হবে না, বারবার এরকম জ্ঞান হারানো মোটেই ভালো না।

চক্রধারীবাবু বললেন, আমি কি তা হলে বাড়ি ফিরে যাবো ? আমার তা হলে কোন চিকিৎসার দরকার নেই।

ডক্তর মৌলিক বললেন, আপনার তো কোনো অসুখ নেই, তা হলে আর চিকিৎসা হবে কেন ?

চক্রধরবাবু বললেন, বেশী ঠিক আছে, বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার মেয়েকে সেই কথাই বলবো। কী সব ভুতুড়ে ব্যাপার রে বাবা ! আমি ঘুমের ঘোরে সবুজ আলো বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। আর এখানে দুটো ছেলেও সেই সবুজ আলো, সবুজ আলো বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল !

বিমান বললো, আপনি কিন্তু অজ্ঞান হন নি !

চক্রধারীবাবু রীতিমতন অবাক হয়ে বললো, আমি অজ্ঞান হবো কেন ? জলজ্যান্ত সুস্থ লোক···আমার কোনো দিন মাথা ঘোরে না, বুক ধড়ফড় করে না, আমি কেন অজ্ঞান হবো !

বিমান বললো, আমাদের স্বপন যখন রামু নামে ছেলেটাকে দেখে, তখন ওরা দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আবার আজ একটু আগে স্বপন আর রামু দু'জনেই এই চক্রধারীবাবুকে দেখে অজ্ঞান হয়ে গেল। কিন্তু চক্রধারীবাবুর কিছু হলো না। অথচ, উনিও সবুজ আলোর লোক !

চক্রধারীবাবু বললেন, আমি সবুজ আলোর লোক কি মশাই ! আমি ট্রাক চালাই, কারুর ব্যাপারে মাথা গলাই না। আমি কোনো লাল বা সবুজ আলোর লোক নই !

এই সময় স্বপন দুটো ঘরের দরজার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। এর মধ্যেই তার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

চক্রধারীবাবু বেশ খানিকটা যেন ভয়ে ভয়েই তাকিয়ে রইলেন স্বপনের দিকে।

স্বপন এবার আর চেঁচিয়েও উঠলো না, চক্রধারীবাবুকে চিনতেও পারলো না।

সে বিমানের কাছে এসে বসলো, তোরা এই ঘরে বসে গল্প করছিস, আর আমাকে পাশের ঘরে শুইয়ে রেখেছিলি কেন রে ?

বিমান বললো, তুই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি !

স্বপন বললো, আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম ? কেন ?

প্রিয়ব্রত পেছন থেকে ইঙ্গিত করছে, যাতে বিমান স্বপনকে এইসব কথা এক্ষুনি না বলে দেয়।

কিন্তু বিমান সে দিকে দেখতে পেল না। সে আবার স্বপনকে বললো তুই আর রামু এই ভদ্রলোককে দেখামাত্র কেমন যেন হয়ে গেলি। 'সবুজ আলো,' 'সবুজ আলো' বলে চেঁচিয়ে ছুটে এঁকে জড়িয়ে ধরেই অজ্ঞান হয়ে গেলি !

স্বপন চক্রধারীবাবুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলো। তারপর ভুরু কুঁচকে বললো, এই ভদ্রলোক কে ? আগে তো এঁকে কখনো দেখি নি !

চক্রধারীবাবু যেন অনেকখানি স্বস্তি পেয়ে বললেন দেখলেন তো আপনারা, আমি ঠিকই বলছিলুম। আমিও এই ছেলেটিকে চর্মচক্ষে কোনদিন দেখি নি।

ডক্টর মৌলিক বললেন, ব্যাপারটা যে ক্রমশ আরও দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। রামু ছেলেটির কী হলো দেখি !

তিনি পাশের ঘরে গিয়ে দেখলেন রামুর জ্ঞান ফিরে এসেছে, সে খাটের ওপর ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বসে আছে।

এর আগে স্বপন আর রামু দু'জনেই অনেক বেশী সময় অজ্ঞান হয়ে ছিল। এবার ওদের জ্ঞান ফিরে এসেছে বড জোর দশ মিনিটের মধ্যে।

এ ঘরে এসে রামুও চক্রধারীবাবুকে দেখে চিনতেই পারলো না।

সে কাঁদো কাঁদো ভাবে বললো, হামায় ভুখ লেগেছে। আমি ঘরকে যাবো !

চক্রধারীবাবু বললেন. জিলিপি খাবে ? স্টেশনের ধারে খুব গরম গরম জিলিপি ভাজতে দেখেছি। দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি।

ডক্টর মৌলিক বললেন, না, না, আপনাকে যেতে হবে না। আমার আর্দালিই আনিয়ে দেবে।

কিন্তু চক্রধারীবাবু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে চলে গেছেন। পেছন না ফিরেই বললেন, এই আমি যাবো আর আসবো। আপনারা ততক্ষণ কথা বলুন না ! আমারও খুব খিদে পেয়েছে কি না !

প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ডক্টর মৌলিক ততক্ষণ রামুকে এক কাপ দুধ আর দু'খানা বিস্কুট খেতে দিলেন। স্বপন কিছুই খেল না, কারণ ও দুধ আর বিস্কুট এই দুটো জিনিসই খুব অপছন্দ করে। তা ছাড়া তার খিদে পায় নি।

বিমান রামুকে দেখিয়ে স্বপনকে জিজ্ঞেস করলো, তুই এই ছেলেটিকে আগে দেখেছিস কখনো !

স্বপন বললো, ঐ তো পাশের ঘরে খাটে আমার পাশে শুয়ে ছিল। কে এই ছেলেটি ?

আমরা দহিজুড়ি গ্রামের দিকে গিয়েছিলাম, সেখানে রাস্তায় এই ছেলেটির সঙ্গে তোর দেখা হলো, তুই ওকে দেখে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলি। সে কথা তোর মনে নেই ?

স্বপন বললো, কী পাগলের মতন কথা বলছিস ? আমি ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরবো কেন ?

প্রিয়ব্রত আর বিমান চোখাচোখি করলো।

প্রিয়ব্রত এবার রামুকে জিজ্ঞেস করলো, রামু ভাইয়া, তুম এহি দাদাকো আগারি কভি দেখা ?

রামু বেশ বাংলা জানে। সে বললো, না, দেখি নি।

—আচ্ছা রামু, তুমি সবুজ বাত্তি দেখেছো কোথাও ?

রামু দুদিকে মাথা নাড়লো।

বিমান হঠাৎ খুব বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, দূর ছাই ! এ ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না। যাই হোক গে, স্বপন আর রামু তো ভালো হয়ে গেছে, চলেন, প্রিয়দা, এবার আমরা কলকাতায় ফিরে যাই।

প্রিয়ব্রত বললো, সেই ভালো।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ডক্টর মৌলিক বললেন, সেই চক্রধারীবাবু কোথায় গেলেন ? উনি তো এখনো ফিরলেন না জিলিপি নিয়ে ?

প্রিয়ব্রত বললো, তাই তো, প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেল। উনি কি এক ঝাঁকা ভর্তি জিলিপি আনাবেন নাকি ?

ডক্টর মৌলিক বললেন, আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে। আপনারা বরং বসুন··· ।

প্রিয়ব্রত বললো, না, না, আমরা আর বসতে চাই না। আমরাও বরং স্টেশনের দিকে এগোই। চক্রধারীবাবুর কাছ থেকে ওখানেই বিদায় নিয়ে নেবো। তারপর রামুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমরা জিপ নিয়ে ফিরবো কলকাতার দিকে।

এর পরও ডাক্তারবাবুর অনুরোধে মিনিট দশেক অপেক্ষা করলো ওরা। কিন্তু চক্রধারীবাবু ফিরলেন না।

ডাক্তারবাবুকে হাসপাতালের কাছে ছেড়ে দিয়ে ওরা জিপটা নিয়ে চলে এলেন স্টেশনের কাছে। পথে চক্রধারীবাবুর দেখা পাওয়া গেল না। জিলিপির দোকানেও তিনি নেই। দোকানদারের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল, ঐ রকম চেহারার কোনো লোক তার কাছ থেকে আধঘণ্টার মধ্যে জিলিপি কিনতে আসে নি।

ডক্টর মৌলিকের কোয়ার্টার থেকে জিলিপির দোকানটা আর কতটাই বা পথ। এর মধ্যে ভদ্রলোক কোথায় উধাও হয়ে গেলেন ? অথবা ইচ্ছে করেই চলে গেলেন কোথাও ?

[ক্রমশঃ]


যারা পঙ্গু ও অসমর্থ, তাদের জন্যেও
১৯৮১ কে করে তুলুন
একটি আনন্দময়
নববর্ষ
রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৮১ সালটি অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য আন্তর্জাতিক বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ভারত সরকার সাধারণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যগুলি সর্বান্তকরণে সমর্থন করে।
বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন—
মিনিস্ট্রি অফ
সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার
গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া
শাস্ত্রী ভবন
নিউ দিল্লী-১১০০০১
davp

Postal Regn.No WB/EC-166 JHALMAL Jan-Feb '81
N. P. Reg. No R N 32832/78 (MAGH 1387)